হৃদয় গলে সিরিজ-১৪

সোনালী সংসার

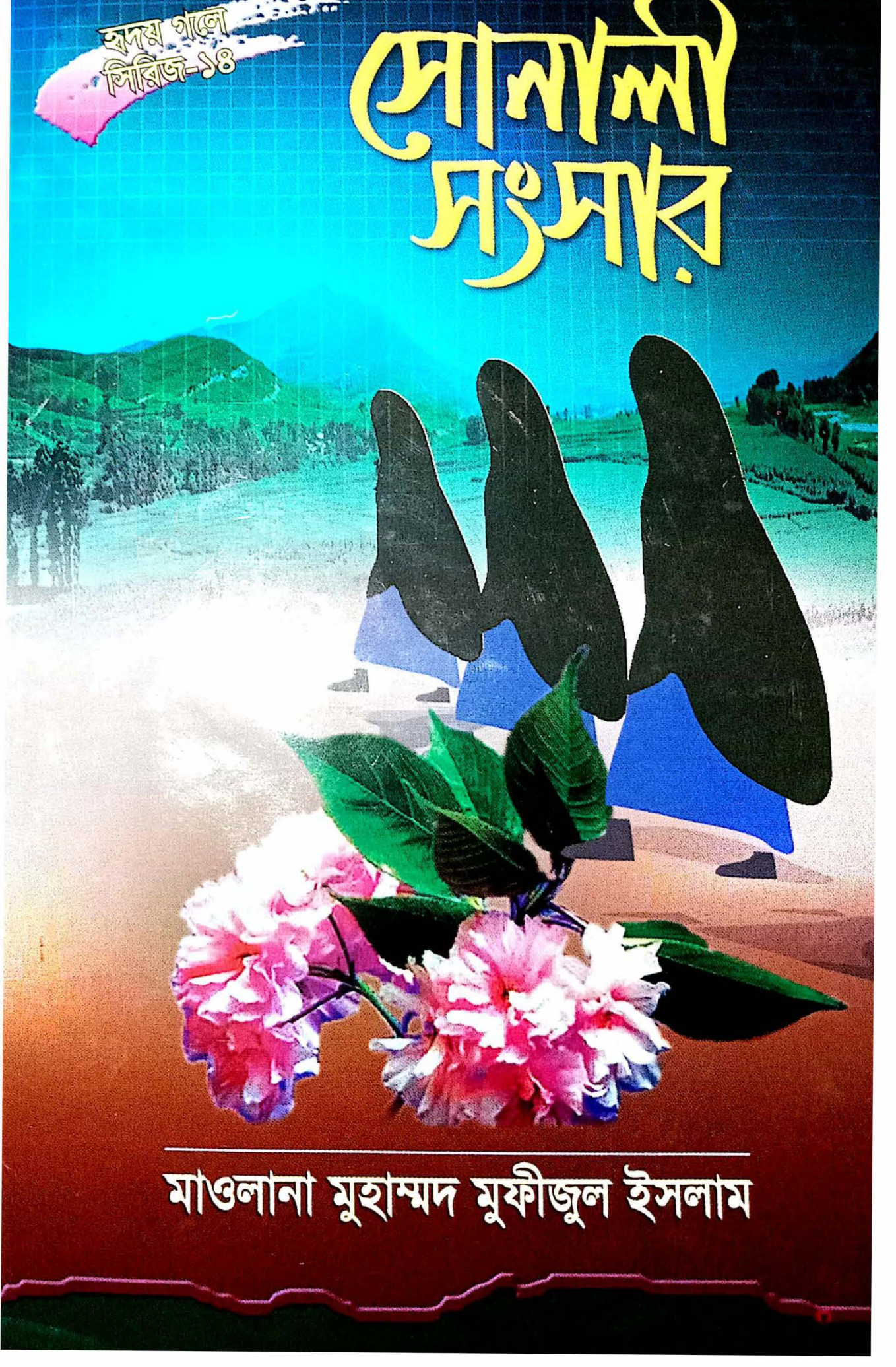

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

সিরিজ—১৪

সোনালী সংসার

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

সম্পাদনায়

মাওলানা আবুল কালাম মাসূম

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.smfoundationbd.com

সোনালী সংসার

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

প্রকাশক ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০০৫ইং, শাওয়াল- ১৪২৬ হিজরী।

শব্দ বিন্যাস ঃ মাওলানা হুসাইন আহমাদ, লালবাগ, ঢাকা।

প্রচ্ছদ ঃ মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, সিটি গ্রাফিক্স, পল্টন, ঢাকা।

মূল্য

একশত বিশ টাকা মাত্র

Sonali Sangsar by Mowlana Md. Mofizul Islam. Edited by Mowlana Abul Kalam Masum. Published by Islamia Kutobkhana, Banglabazar, Dhaka. Printed by Islamia Printing press, Paridash road, Dhaka-1100.
Price : 70.00 (Seventy taka only).

www.smfoundationbd.com

অর্পণ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শাশুড়ী
মোসাম্মৎ হাফেজা বেগম — এর
দস্ত মোবারকে।
— লেখক।

লেখকের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা
দত্তপাড়া, নরসিংদী।

ফোনঃ ০১৭২-৭৯২১৯৩, ০১৯২-৪৭২৮৯৯

www.smfoundationbd.com

দুটি কথা

আনন্দ বিগলিত হৃদয়ে শত-কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি সেই মহান সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামীনের, যার একান্ত অনুগ্রহ ও সীমাহীন দয়ায় আত্মপ্রকাশের যাবতীয় স্তর অতিক্রম করে **'সোনালী সংসার'** নামক উপন্যাসখানা আলোর মুখ দেখতে পেরেছে। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যার সোনালী দাম্পত্য জীবন সবার জন্যই অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য।

'সোনালী সংসার' আমার প্রথম উপন্যাস। এটি কেমন হলো কিংবা উপহাকে আদৌ উপন্যাস বলা যায় কিনা সে বিচারের ভার পাঠক-পাঠিকাদের হাতে। তবে এটা জোর দিয়েই বলতে পারি, সোনালী সংসারকে সব দিক থেকে সুন্দর ও সুখপাঠ্য করার জন্য আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিলো না। তদুপরি মুহতারাম সম্পাদক সাহেব ছাড়াও আরো কয়েকজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে এর পান্ডুলিপি দেখিয়েছি এবং তাঁদের পরামর্শ মোতাবেক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করেছি। এতদ্সত্ত্বেও বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকারা যদি এই উপন্যাসের ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভালো মন্দের দিকগুলো তুলে ধরে দু'কলম লিখে পাঠান তবে সত্যিই অত্যন্ত খুশি হবো। সেই সঙ্গে আগামীতে উপন্যাস লিখার ক্ষেত্রে উপকৃত হবো যথেষ্ট পরিমাণে।

মাসুম-ফারহানা এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। এরাই সোনালী সংসারের কেন্দ্রবিন্দু। এদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। আমি এ উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছি, স্বামী-স্ত্রী দীনদার এবং একে অপরের সহযোগী হলে পারিবারিক জীবনেই কেবল শান্তি আসে না, সমাজের লোকজনও উপকৃত হয় যথেষ্ট পরিমাণে; অনেক পথহারা বিপথগামী মানুষও পথের সন্ধান পায়; উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত হয় ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে।

যারা এ উপন্যাস লিখা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। বিশেষ করে ইসলামিয়া কুতুবখানার মালিক মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা সাহেবের ঋণ কোনো দিন আমি শোধ করতে পারবো না। কারণ তিনিই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি উপন্যাস লিখার ব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। এমনকি আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাবাজারের এক লাইব্রেবী থেকে নিজের পকেট থেকে প্রায় সাতশ'রও অধিক টাকার উপন্যাস কিনে দিয়েছেন। সত্যিই তাঁর এ অবদান কখনো ভোলার নয়। আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আরেকটি কথা। হৃদয় গলে সিরিজের ১৭তম খন্ডের মতামত বিভাগটি শুধুমাত্র কবিতা দ্বারা সাজানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সুতরাং ছোট বড় সব ধরনের কবির নিকট অতি শীঘ্র কবিতা পাঠানোর অনুরোধ রইল। আর হ্যাঁ, এর পুরস্কার কিন্তু প্রথম ১০ জন কিংবা ১টি বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং সবাইকে ডবল অর্থাৎ দুটি করে বই উপহার দেওয়া হবে। পরিশেষে সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

দোয়াপ্রার্থী

মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

তাং ১২/১১/০৫ইং

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ আকাবিরে উম্মতের দীপ্ত প্রদীপ
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ উস্তাদুল আসাতিজা
শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (দাঃ বাঃ) এর মূল্যবান

অভিমত ও দু'আ

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহর। অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর।

আল্লাহ ওয়ালাদের সোহ্বত ও সংস্পর্শ মানুষের আত্মার সংশোধন ও নফসের ইসলাহের উত্তম উপায়। অনুরূপভাবে বুজুর্গানে দ্বীন ও মনীষীদের জীবনী, জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী এবং চরিত্রগঠনমূলক বিভিন্ন গল্প-কাহিনী পাঠের মাধ্যমেও মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধিত হয়। এই জন্যই বলা হয়, "পূর্বেকার লোকদের ঘটনাবলীতে রয়েছে পরবর্তীদের জন্য উপদেশাবলী।"

হৃদয়বিদারক ও চরিত্রগঠনমূলক বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য সত্য ঘটনার সমন্বয়ে স্নেহভাজন তরুণ লেখক মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম "যে গল্পে হৃদয় গলে" (চলমান অংশের নাম সোনালী সংসার) নামক বইখানা রচনা করেছেন। সেই সাথে ঘটনার শিক্ষণীয় দিকগুলো প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে পাঠকের হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এতে লেখক সফল হয়েছেন বলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উপরন্তু হৃদয়ের গভীরে এতটা জোড়ালোভাবে রেখাপাত করার মত সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষার চরিত্রগঠনমূলক এমন সুন্দর গল্পগ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুব কমই দেখা যায়। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রাণ খুলে দোয়া করি, হে আল্লাহ! তুমি লেখককে ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান ক্ষুরধার কলম সৈনিক হিসাবে কবুল কর এবং তার খেদমতকে উম্মতের জন্য হিদায়াতের উসিলা বানাও। আমীন।

(শাইখুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক)

ফকীহুল উম্মাহ মুফতী মাহমুদুল হাসান গংগুহী (রাহঃ) -এর সুযোগ্য
খলীফা জামিয়াতু ইবরাহীম (আ.) মাদরাসার
প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল শাইখুল হাদীস আলহাজ্ব
হযরত মাওলানা মুফতী শফীকুল ইসলাম সাহেবের মূল্যবান

বাণী ও দু'আ

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জনের জন্য ইসলামের কোন বিকল্প নেই। একজন মানুষ তখনই সুখ-সমৃদ্ধি ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে যখন সে ইসলামের বিধি-বিধানগুলো সঠিকভাবে জেনে তদানুযায়ী আমল করে। আর ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো নির্ভরযোগ্য, সৎ ও খোদাভীরু লেখকদের বই-পুস্তক ও কিতাবাদী পাঠ করা।

মানুষের একটি স্বভাবজাত ধর্ম হল, তারা একদিকে যেমন হৃদয়বিদারক গল্প-কাহিনী শুনতে ও পড়তে ভালবাসে ঠিক তেমনি বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে কোন কঠিন বিষয় অনুধাবন করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে সহজ হয়। স্নেহাস্পদ মাওলানা মুফীজুল ইসলাম তার "যে গল্পে হৃদয় গলে" (চলমান অংশের নাম সোনালী সংসার) নামক গ্রন্থের মাধ্যমে মূলতঃ এ কাজটিই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আঞ্জাম দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি একজন আদর্শ মানবের প্রধান প্রধান করণীয়-বর্জনীয় কাজগুলোকে বিভিন্ন সত্য ঘটনা উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তা হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, শিক্ষাবিহীন অবাস্তব গল্প-কাহিনীর পরিবর্তে চরিত্রগঠনমূলক এ গল্প-কাহিনীগুলো সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের গল্প পাঠের আনন্দদানের পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু জানতে সাহায্য করবে এবং সেই সাথে তদানুযায়ী জীবন গঠন করতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিতও করবে।

দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা যেন বইটিকে উম্মতের হিদায়েতের জন্য কবুল করেন এবং ভবিষ্যতে লিখককে এ জাতীয় আরও গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করার তাওফীক নসীব করেন। আমীন।

(মাওলানা মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম)

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম বিশিষ্ট লেখক মোনাযেরে আযম আল্লামা আলহাজ্ব

হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেবের

মূল্যবান বাণী ও দোয়া

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। শত কোটি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীকুল শিরমনি, দোজাহানের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তার সমস্ত পরিবার পরিজনের উপর।

ইসলাম ধর্ম মহান আল্লাহ তায়ালার একমাত্র মনোনীত ও পরিপূর্ণ ধর্ম। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত উদ্ভুত যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু, সুন্দর ও কল্যাণকর সমাধান একমাত্র ইসলাম ধর্মেই রয়েছে। আর ইসলামের সুন্দরতম আদর্শ ও বিধিবিধানগুলো মানব জাতির নিকট পৌঁছে দেয়ার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো লিখনী। অন্যান্য পন্থার ন্যায় সঠিক লিখনীও জাতির চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন এবং তাদেরকে সৎ, চরিত্রবান ও ধর্মমুখী করার একটি সহজ, সুন্দর ও চমৎকার পন্থা। আমার জানা মতে এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই স্নেহের তরুণ আলেম মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম "যে গল্পে হৃদয় গলে" নামক বইখানা রচনা করেছেন। আমি মনে করি বর্তমান আর্ত-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় বইয়ের প্রকাশনা একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। সাথে সাথে আমি এও বিশ্বাস করি যে, তার বইয়ের প্রতিটি ঘটনা পাঠকের মনোজগতে কেবল আলোড়নই সৃষ্টি করবে না, ইসলামের বিধি-বিধানগুলো জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

লেখক এ বইটির ৪র্থ অংশ থেকে শুরু করে পরবর্তী অংশগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন নামে সিরিজ আকারে বের করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, উহাকেও আমি বাস্তব ও যুগোপযোগী উদ্যোগ বলেই মনে করি।

আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া করি, রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ তা'আলা যেন তার এ কলমী জিহাদকে কবুল করেন এবং একে উম্মতের জন্য হিদায়েতের উসিলা বানান। আমীন।

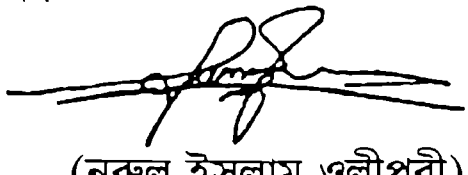

(নূরুল ইসলাম ওলীপুরী)

সোনালী সংসার

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

[এক]

সেদিন ছিলো পূর্ণিমা। জ্যোছনা ভরা রাত। নাজিয়া ঝরনার পাশে একটি পাথর খণ্ডে একা একা বসে আছে। জ্যোছনার আলো ঝরনার পানিতে এক অপূর্ব ছন্দের সৃষ্টি করে চলেছে। ফুলের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বাগানের চারদিকে। নাজিয়া আপন মনে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত বারবার তিলাওয়াত করছে। তার সুললিত কণ্ঠের সুমিষ্ট আওয়াজ সমস্ত বাড়ির স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়ছে।

নাজিয়া এখন স্বামীর বাড়িতে। বাড়িটি বেশ বড়। রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে। চারদিকে পাকা দেয়াল। গেইট দিয়ে ঢুকেই রাস্তার বাম দিকে একটি সুন্দর বাগান। সেই সাথে ঝরনা। নাজিয়ার শ্বশুর জামিল সাহেব একজন ধার্মিক ও রুচিশীল লোক। বাড়ি নির্মাণের সময় আলো বাতাসের পাশাপাশি পর্দা-পুশিদার দিকটিও তিনি গুরুত্বের সাথে খেয়াল রেখেছেন।

একটু পূর্বে নাজিয়া ইশার নামাজ আদায় করেছে। নামাজ শেষে কায়মনোবাক্যে স্বামীর জন্য মোনাজাত করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। জামিল সাহেব জরুরি এক কাজে স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে গেছেন। এখনও ফিরেন নি। যাওয়ার সময় বলে গেছেন, বউমা! আমাদের ফিরতে একটু দেরি হবে। তোমরা সাবধানে থেকো।

বাড়িতে এখন নাজিয়া ছাড়াও আছে তাহের ও তামান্না নামক তার দুই সন্তান এবং কাজের ছেলে সোহাইল। তাহের ও তামান্না খাওয়া দাওয়া শেষে ঘুমিয়ে পড়েছে। সুতরাং বাড়িটিকে এক রকম নির্জনই বলা চলে। আর এই নির্জনতার সুযোগকেই কাজে লাগিয়েছে নাজিয়া। একটু উঁচু আওয়াজেই তেলাওয়াত করছিল সে। সেই সাথে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল প্রিয়তম স্বামীর জন্য।

নাজিয়ার স্বামীর নাম মাসুম। তিনি মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। ১০ দিন গত হলো তিনি বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক) এর পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে পাবনা গিয়েছেন। গতকাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আজ তিনি বাসায় ফিরছেন। দুপুরের দিকে ফোন করে স্ত্রীকে সংবাদটা জানিয়ে দিয়েছেন।

এক বুক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নাজিয়া স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছে। তার হৃদয়ে আজ এক অদ্ভুত অনুভূতি। একটা কেমন যেন উম্মাদনা তার সমস্ত অন্তরটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। একটা অভূতপূর্ব আনন্দে হৃদয়-মন নেচে উঠছিল তার।

নাজিয়া যখন ঢাকা গোলাপবাগ মহিলা মাদরাসার কুদুরী জামাতের ছাত্রী তখনই তার বিয়ে হয়। বিয়ের পরও সে লেখাপড়া বন্ধ করে নি। পড়াশুনার প্রতি প্রচন্ড ঝোঁকের কারণে শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ও স্বামীর অনুমতি নিয়ে সে আরও চার বছর লেখাপড়া করে দাওরায়ে হাদীস শেষ করেছে। ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছাত্রী হওয়ায় সবাই তাকে আদর করতো। বড়রা স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতো আর ছোটরা আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করতো। আর সেও সবার সাথে হাসিমুখে ভদ্রতার সাথে কথা বলতো। বিপদে আপদে এগিয়ে যেত। কোনো ছাত্রী পড়া না বুঝলে বা কেউ কোনো পড়া জিজ্ঞেস করলে সে কোনোরূপ বিরুক্তিবোধ না করেই সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলে দিত। কোনো ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে জান প্রাণ দিয়ে তার সেবা করতো। মাথায় পানি দিত। সময় মতো ঔষধ খাওয়াতো। কাপড় চোপড় ধুয়ে দিত। এমনকি নিজের হাতে খানা খাওয়াতো। অসুস্থ মেয়েটি গরিব হলে নিজের টাকা দিয়ে পথ্য-ঔষধ ইত্যাদি কিনিয়ে আনত। মোটকথা শুধু ভালো ও মেধাবী ছাত্রী হিসেবেই নয়; সুন্দর, ভদ্র, মার্জিত ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলের নিকট সে ছিলো পরম প্রিয়।

জ্যোছনার আলোতে পাথর খণ্ডে বসে নাজিয়া যে আয়াতটি একাধিকবার তেলাওয়াত করছিল তা ছিল সূরা রুমের ২১ নং আয়াত। আয়াত খানা যতবার তেলাওয়াত করছিল ততই ভালো লাগছিল তার। অফুরন্ত আনন্দ উচ্ছ্বাসে তার দীপ্ত উজ্জ্বল মুখখানা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। হৃদয়ের সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে মনোহারিণী সুরে যে আয়াতখানা সে পাঠ করছিল তার অর্থ হলো-

"মহান আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা ও দয়া দান করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নির্দেশাবলি রয়েছে।[১]

মাদরাসার ছাত্রী হওয়ার কারণে নাজিয়া কুরআনের অর্থ বুঝত। সে যখন আয়াত খানা তেলাওয়াত করছিল তখন এর অর্থ ও ভাব বারবার তার হৃদয়পটে ভেসে উঠছিলো। সে ভাবছিলো, বিয়ের পূর্বে সর্বপ্রথম যেদিন এ আয়াত ক্লাসে পড়েছিলাম, সেদিন এর বাহ্যিক অর্থ বুঝলেও মর্মার্থ বুঝি নি। কিন্তু এখন.....। এতটুকু চিন্তা করে সে নিজেই লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করলো।

নাজিয়া আজ দশ দিন যাবত স্বামীকে দেখে নি। স্বামীর মধুর ডাক এ কয়দিন তার হৃদয়ে সুধা বর্ষণ করে নি। কিন্তু নাজিয়ার কাছে দশ দিন যেন দশ মাসের মতো মনে হচ্ছে। সময় যেন ফুরাতে চায় না। প্রথম দুই তিন দিন এতটা খারাপ না লাগলেও দিন বাড়ার সাথে সাথে অন্তরে হাহাকার আর শূণ্যতা যেন পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে দুপুরের ফোন পাওয়ার পর এ কয়টি ঘন্টা যেন শেষই হতে চাচ্ছে না।

স্বামীকে একান্ত করে কাছে পাওয়ার এই অপেক্ষার প্রহরে নাজিয়ার আজ কত কথা মনে পড়ছে। কত স্মৃতি, কত দৃশ্য উঁকি-ঝুকি মারছে তার হৃদয়ের আয়নায়। এসব কথা ভাবতে ভাবতে কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়েছে সে।

স্মৃতির পাতা উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে আটকে গেলো নাজিয়া। তার হৃদয়পটে ভেসে উঠলো এমন একটি দৃশ্য, সেই সাথে মনে পড়লো এমন একটি ঘটনার কথা, যা আজও সে ভুলতে পারে নি। ভুলতে পারবেও না কোনোদিন। বস্তুত এ মুহূর্তে ঘটনাটি মনে পড়ায় আজ যেন আয়াতের মর্মার্থটি আরও বেশি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার কাছে।

বাসর রাতে নাজিয়া যখন স্বামীকে একান্ত আপন করে কাছে পেয়েছিলো, যখন স্বামীর বুকে মাথা রেখে কল্পনার পাখায় ভর করে ভবিষ্যতের সুখ স্বপ্ন দেখছিলো, ঠিক তখনই স্বামীর মুখ থেকে এ ঘটনাটি শুনেছিলো সে।

নাজিয়ার স্বামী মাসুম অত্যন্ত ভালো মানুষ। সেও এক বুক স্বপ্ন নিয়ে নাজিয়াকে বিয়ে করেছে। তার একান্ত আশা, স্ত্রী নাজিয়াকে নিয়ে এমন এক

---

১. সূরা রুম, পারা ও আয়াত- ২১

সুখের নীড় রচনা করবে যার নজির বর্তমান পৃথিবীতে খুব কমই আছে। গড়ে তুলবে এমন একটি সোনালী সংসার যা থেকে অন্যান্য দম্পতিরাও ছবক গ্রহণ করতে পারবে।

বাসর রাতে এক আনন্দঘন মুহূর্তে মাসুম বললো, নাজিয়া! আজকের এই মধুর রজনীতে কোনো ঘটনা শুনিয়ে সময় নষ্ট করতে যদিও মন চাইছে না, তথাপি না বলে থাকতে পারছি না। তবে আমার বিশ্বাস, কথাগুলো তোমারও ভালো লাগবে। শুনবে কি তুমি?

নাজিয়া এতক্ষণে স্বামীর সাথে ফ্রি হয়ে গেছে। সংকোচ ও জড়তা বিদায় নিয়েছে বেশ আগেই। সে বলল, অবশ্যই বলবেন। আপনি কোনো কথা বলতে চাইবেন, আর আমি শুনবো না, এটা কখনোই হতে পারে না!

নাজিয়াদের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া রেল স্টেশন সংলগ্ন মৌড়াইল গ্রামে। তাদের মূল বাড়ি সরাইল থানার পানিশ্বর গ্রামে হলেও বছর দশেক আগে তার পিতা ইসমাঈল খাঁ এখানে এসে জমি কিনে বাড়ি করেছেন। ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ ছায়াঘেরা এ বাড়িটি স্টেশন থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ট্রেনের যাত্রীরা জানালার ফাঁক দিয়ে তাকালে অনায়েসে তা দেখতে পারে। বিয়ের পর মাসুম-নাজিয়ার প্রথম রাত্রিটি এ বাড়িতেই কেটেছিলো।

স্ত্রীর কথায় মাসুম খুব খুশি হলো। বললো, নাজিয়া! তুমি কেবল দেখতেই সুন্দর নও, কথায়ও সুন্দর।

নাজিয়া বললো, দুআ করবেন, আল্লাহ পাক যেন কাজেও সুন্দর বানিয়ে দেন। আপনার সেবা করে, মন খুশি রেখে দুনিয়া থেকে যেন বিদায় নিতে পারি- রাব্বুল আলামীনের নিকট সর্বদা এ কামনাই করি।

আল্লাহ পাক তোমার মনের বাসনা পূর্ণ করুক, একথা বলে স্ত্রীকে আরো গভীরভাবে কাছে টেনে নেয় মাসুম। এরপর বলতে থাকে-

নাজিয়া! গতকাল রবিবার বাদ আছর বিশ্ব ইজতেমায় তোমার আমার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। একথা তুমিও জানো। প্রথমে আমার ইচ্ছা ছিল সোমবার দিন আখেরী মোনাজাত শেষে বাড়ি ফিরবো। তারপর আল্লাহ পাকের যখন মর্জি হয় তখন তোমার সাথে সাক্ষাত করবো। কিন্তু বিয়ের কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর সময় যতই যেতে লাগলো ততই অস্থিরতা বৃদ্ধি পেলো। রাতটা কোনো রকমে ছটফট করে কাটালাম।

ফজরের নামাজ আদায় করার পর অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পেলো। একদিকে মোনাজাত, অপরদিকে তুমি। মনের সাথে অনেক যুদ্ধ করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কাছে হেরে গেলাম। মন বললো, আখেরী মোনাজাত শেষে ইজতেমার ময়দান থেকে বাড়ি ফিরতেই অনেক রাত হয়ে যাবে। তখন তো আর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় থাকবে না। সুতরাং বাধ্য হয়েই পরবর্তী রাতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। নাজিয়ার চন্দ্রমুখ দেখতে এত বিলম্ব, তা কি তোমার সইবে?

আমার মনের এ অস্থিরভাব চোখে মুখেও ফুটে উঠলো। ঘনিষ্ট কয়েকজন মুরুব্বীর সাথে পরামর্শ করলাম। তারা চেহারা দেখেই আমার মনের অবস্থা বোধ হয় টের পেয়েছেন। তাই বললেন, তুমি অমুক অমুককে নিয়ে এখনই বাড়ি চলে যাও, আমরা আখেরী মোনাজাত শেষে ফিরব ইনশাআল্লাহ।

মুরুব্বীদের কথা শুনে মনটা আনন্দে কানায় কানায় ভরে উঠলো। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাদের জন্য দুআ এলো। অনুমতি পেয়ে দেরি করলাম না। সঙ্গে সঙ্গে টঙ্গী রেল স্টেশনে চলে এলাম।

একটু পর একখানা আন্তঃনগর ট্রেনের খবর হলো। কাউন্টারে গিয়ে টিকেট বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাইজান! এ ট্রেনখানা বি,বাড়ীয়া থামবে কি? তিনি বললেন, এমনিতো থামে না তবে ইজতেমা উপলক্ষে থামবে।

আমরা লোকটির কথা বিশ্বাস করে ট্রেনের অপেক্ষায় রইলাম। একটু দাঁড়াতেই ট্রেন এসে গেলো। গাড়িতে লোকজন তেমন ছিলো না। আমরা ঝটপট উঠে আসন গ্রহণ করলাম। ট্রেন চলতে লাগলো। কিছুক্ষণ চলার পর পাশে উপবিষ্ট একজন যাত্রীকে নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, ভাই! এ ট্রেনখানা বি,বাড়ীয়া স্টেশনে স্টপিজ দিবে কি?

লোকটি নির্দ্বিধায় বলে উঠলো, না।

লোকটির ছোট্ট এক 'না' শব্দে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেলো। তবে একথা ভেবে সামান্য আশ্বস্ত হলাম যে, লোকটি হয়তো জানে না যে, ইজতেমা উপলক্ষে মহানগর ট্রেনটি বি,বাড়ীয়া স্টপিজ দিবে।

কিন্তু একটু পর বিশ্বাস হলো, লোকটির কথাই ঠিক। কেননা গার্ডকে এ

ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সেও একই উত্তর শোনাল। সেই সাথে অন্যান্য যাত্রীরাও বলল, লাকসামের আগে এই ট্রেন কোথাও থামবে না।

আমি তাদেরকে বললাম, টঙ্গী স্টেশন থেকে আমাদেরকে তো বলা হয়েছে, এই ট্রেন ইজতেমা উপলক্ষে বি,বাড়ীয়াসহ আরো কয়েকটি স্থানে স্টপিজ দিবে।

তারা বলল, যিনি আপনাদেরকে একথা বলেছেন তিনি এ ব্যাপারে ভালোভাবে না জেনেই বলে দিয়েছেন।

আমি বললাম, এখন তাহলে কি করতে পারি আমরা?

লোকজন বলল, এখন কিছুই করার নেই। লাকসাম গিয়ে ট্রেন থামলে সেখান থেকে ট্রেন কিংবা বাসে করে বাড়ি ফিরতে হবে।

নাজিয়া! লোকেরা যখন এ কথাগুলো বলছিলো তখন ট্রেনখানা তোমাদের বাড়ী অতিক্রম করছিলো। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। বুকটা তখন ব্যথায় চিনচিন করে উঠল। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ এক দৃষ্টে তোমাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ট্রেন নামক যন্ত্রটির উপরও ভীষণ রাগ হলো। মনের অজান্তেই বেরিয়ে এলো, দেখো না, এ নিষ্ঠুর দানবটি কেমন করে আমাকে প্রেয়সী থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। বারবার চেইন টানতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না। ভাবলাম, যদি কর্তব্যরত লোকজন জিজ্ঞেস করে, ট্রেন থামালেন কেন? তবে কী জবাব দিব। তোমাকে কাছে পাওয়ার জন্য কি নিদারুন যন্ত্রণা, কি কাল বৈশাখীর ঝড় বয়ে চলছে আমার হৃদয় জগতে সে কথাতো আর অন্যকে বলা যায় না। সুতরাং ট্রেন তার আপন গতিতে পাগলের মতো ছুটে চলছে তো চলছেই।

বিশ্বাস করো নাজিয়া! তখন যে আমার মনের অবস্থা কেমন হয়েছিলো তা তোমাকে ভাষায় বুঝাতে পারবো না। বিয়ে হতে না হতেই একটি অচেনা অজানা মেয়ের জন্য হৃদয়ের টান এতটা প্রবল হতে পারে,.তা কোনো দিন কল্পনাও করতে পারি নি। এতটুকু বলে মাসুম থামলো।

নাজিয়া এতক্ষণ স্বামীর কথাগুলো তন্ময় হয়ে শুনছিলো। স্বামী থেমে যেতেই ছোট্ট করে বললো-

ঃ তারপর?

ঃ তারপর কি আর করা! সীটে বসে তাসবীহ হাতে জিকির করতে

লাগলাম। খোদায়ী ফয়সালাকে দিল থেকে মেনে নিলাম। সেই সাথে চিন্তা করে বের করলাম যে, এত কষ্ট করে টঙ্গীর ময়দানে গিয়েও আখেরী মোনাজাতে শরিক না হয়ে চলে আসার কারণেই আমার এ পেরেশানী এসেছে। কেননা, যিনি যে কাজ গুরুত্ব দিয়ে করেন তিনি যদি ঐ কাজে শৈথিল্য বা অবহেলা প্রদর্শন করেন, তবে খোদার পক্ষ থেকে বিপদ আসে। আমি যেহেতু তাবলীগকে নিজের কাজ বানিয়ে নিয়েছিলাম, অত্যন্ত পাবন্দির সাথে এর বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করতাম, সেই আমিই যখন তাবলীগের এক আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন- বিশ্ব ইজতেমা শেষ না করে, মোনাজাতে শরিক না হয়ে চলে যাচ্ছি, কাজেই পেরেশানী তো কিছু হবেই।

ট্রেন এতক্ষণে আখাউড়া স্টেশন ছাড়িয়ে গেছে। বিরামহীনভাবে চলছে সে। থামার কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আমি খোদার দিকে মনোনিবেশ করলাম। গভীর আন্তরিকতাসহ তাকে স্মরণ করলাম। মনে মনে দুআ করলাম-

ওগো রাহমানুর রাহীম দয়াময় প্রভু! এখন আমার মনের কি অবস্থা তা তুমি ভালো করেই জানো। ওগো মাওলা! তুমি তোমার বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করো। তার কৃত অপরাধকে মার্জনা করে দাও। বিশ্ব ইজতেমার আখেরী মোনাজাতে শরিক না হয়ে প্রিয়তমের সাক্ষাতকে প্রাধান্য দিয়ে আমি মহা অন্যায় করে ফেলেছি খোদা। এ অন্যায়ের জন্যই আজ আমার এতবড় পেরেশানী হচ্ছে। এত কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হয়েছি আমি। ওগো রাব্বুল আলামীন! তুমি আমাকে মাফ করে দাও। যদি ট্রেন সত্যি সত্যিই লাকসামের পূর্বে কোথাও না থামে তাহলে আজকে আর নাজিয়ার সাথে সাক্ষাত সম্ভব হবে না। ওগো মাবুদ! তুমি তো সর্বশক্তিমান। সব কিছুই পার তুমি। তোমার অসাধ্য কিছুই নেই খোদা। তুমি তোমার বান্দার উপর অনুগ্রহ করো। যে কোনো উপায়ে ট্রেন থামার ব্যবস্থা করো। নইলে আমার অবস্থা কি হতে পারে, তুমিই তা আমার চেয়ে ভাল জানো।

নাজিয়া! বিশ্বাস করো, আমি এ কথাগুলো এতটাই দৃঢ়তার সাথে আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলছিলাম যে, আমার মনে হচ্ছিলো, আল্লাহর অপরিসীম কুদরতে এই বুঝি ট্রেন থেমে গেলো। আর বাস্তবেও হয়েছিলো তাই।

হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, বান্দা আমার সাথে যেমন ধারণা রাখে আমি তার সাথে তেমন ব্যবহার করি।

এ হাদীস খানা তখন আমার পূর্ণরূপে স্মরণে ছিলো। সাথে সাথে একথাও আমার এক্বিন ছিলো যে, বান্দা যদি নিজের গোনাহের কারণে কোনো বিপদাপদের সম্মুখীন হয় আর তখন সে গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন মেহেরবান খোদা তার অপরিসীম দয়ায় তাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

নাজিয়া! তুমি শুনে আশ্চর্য হবে যে, আমার দুআ শেষ হতে না হতেই গাড়িটি এমন একটি স্টেশনে এসে হঠাৎ করে থেমে গেলো, যেখানে থেকে অতি সহজে টেম্পু ও বাস যোগে দ্রুত ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসা যায়। আরও মজার কথা হলো, যদি গাড়িটি আগের ২/৩টি স্টেশনের যে কোনো একটিতে থামত, তবে পথ কম হলেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ার কারণে কয়েকগুণ সময় বেশি লাগতো।

গাড়ি স্টেশনে থামার সাথে সাথে আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই! এখানে কি এ গাড়ির ষ্টপিজ আছে? লোকটি বললো- না, স্টপিজ নেই। মনে হয় বিশেষ কোনো কারণে থেমেছে। আমি এ ট্রেনে বহুদিন যাবত আসা-যাওয়া করি। কিন্তু কোনো দিন এখানে থামে নি। যাক আপনার জন্য ভালই হলো। অনেক তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছতে পারবেন।

আল্লাহ পাকের সাহায্য পেয়ে মনটা আনন্দে উদ্বেলিত হলো। তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে এলো। মনে মনে অসংখ্যবার আলহামদুলিল্লাহ বলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম।

[দুই]

স্ত্রী নাজিয়াকে খবরটা জানিয়ে মাসুম দেরি করলো না। অল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে ঢাকাগামী একটি বাসে এসে চড়ল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাস ছেড়ে দিল। উল্কা বেগে ছুটে চললো সম্মুখ পানে।

মাসুম খুবই মিশুক ছেলে। তদুপরি সে জানে যে, মুসলমানের সাথে হাসিমুখে কথা বলা, তাদের সাথে পরিচিত হওয়া, খোঁজ-খবর নেওয়া ইত্যাদি সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। তাই এমনটি কখনোই হয় নি যে, তার পাশে

কোনো মুসলমান বসা আছে অথচ তার সাথে সে পরিচিত হয়ে সুন্দর ও বিনম্র আচরণ করে ভাব জমিয়ে তুলে নি।

মাসুমের পাশে ছিল একজন আঠারো-উনিশ বছরের যুবক। মাসুম প্রথমে তার পরিচয় নেয়। তারপর তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করে। যুবকটিও মাসুমের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়। এ দীর্ঘ সফরে একজন মনের মতো সঙ্গী পেয়ে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে সে।

যুবকের নাম রায়হান। বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া থানায়। তার তিন মামা। দুই মামা বাসা নিয়ে ঢাকার মিরপুর পল্লবীতে থাকেন। আরেকজন বগুড়া শহরে ব্যবসা করেন। স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানেই থাকেন।

গত কয়েকদিন পূর্বে রায়হানদের এস. এস. সি পরীক্ষার রিজাল্ট বের হয়েছে। রায়হান খুব ভালো ছাত্র। সে এ প্লাস পেয়ে পাস করেছে। এ খুশির সংবাদটি আত্মীয় স্বজনদের কাছে স্বয়ং পৌঁছানোর জন্য সে আজ ৩/৪দিন যাবত এখান থেকে সেখানে সফর করে চলেছে।

আজ রায়হানের গন্তব্য হলো, ঢাকার পল্লবী। গতকাল সে বগুড়া হতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসেছিলো। এতক্ষণ মাসুম ও রায়হানের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চলছিলো। এবার কথা প্রসঙ্গে রায়হান একটি শিক্ষণীয় বাস্তব ঘটনা মাসুমকে শুনালো। রায়হান বললো-

একদা আমি বগুড়া থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। ফেরার পথে নাগ্‌ডেমরা গ্রামের বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ালাম। সেখানে কয়েকজন লোক পূর্ব থেকেই বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলো। আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই একটি লোক আমার দিকে এগিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করলো-

ঃ ভাই! কোথায় যাবেন?

ঃ উল্লাপাড়া যাবো। আমি সহজভাবে জবাব দিলাম। এমন সময় দূর থেকে একটি কোচ আসতে দেখা গেলো। কোচটি কাছাকাছি চলে এলে লোকটি বললো-

ঃ ভাই! এটি 'কোহিনুর সার্ভিস'। ঢাকা যাবে। আপনি যদি উল্লাপাড়ার কথা বলেন, তবে হেলপার আপনাকে কিছুতেই গাড়িতে উঠতে দেবে না। তাই আপনি ঢাকা যাওয়ার কথা বলে গাড়িতে উঠে যাবেন। পরে উল্লাপাড়ায়

গিয়ে কোনো এক কারণ দেখিয়ে নেমে পড়বেন। এতে অল্প সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন।

আমি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার গন্তব্য কোথায়?

লোকটি বললো, আমি শাহজাদপুর যাবো। তবে আপনাকে যে কৌশল শিখিয়ে দিয়েছি, তা আমিও অবলম্বন করবো। নচেৎ বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

আমি বললাম, ভাই! মিথ্যা বলা মহাপাপ। মিথ্যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। হাদীস শরীফে আছে, সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় আর মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে। সুতরাং সামান্য একটু সুবিধা লাভের জন্য কিছুতেই মিথ্যা বলতে পারবো না। আর আপনাকেও আমি অনুরোধ করে বলছি, প্রয়োজনে একটু দেরি করে বাসায় ফিরুন, তবুও মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না। ইতোমধ্যে কোহিনুর কোচটি এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি হেলপারকে মিথ্যাভাবে ঢাকার কথা না বলে সত্যভাবে উল্লাপাড়ার কথাই বললাম। হেলপার জানালো, এটি ঢাকার কোচ, আপনাকে নেওয়া যাবে না। সুতরাং আমি পূর্বের স্থানেই অন্য বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

এদিকে লোকটি ঢাকার কথা বলে কোচে চড়ে বসলো। উঠার সময় আমার দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের স্বরে বললো- আপনি তো একটা গ্রেট বোকা। মনে রাখবেন, সব জায়গায় সুফীগিরি চলে না।

আমি বললাম, ভাই! আমি বোকা আছি ভালো আছি। কিন্তু মিথ্যুক তো নই।

কোহিনুর চলে গেল। পনের বিশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম। কোন বাস এলো না। কিন্তু খোদার কুদরত বুঝা বড় দায়। একটু পর একটি ভ্যান চালক এসে বললো- কোহিনুর কোচটি মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। একজন সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। পঁচিশজন আহত হয়েছে। তম্মধ্যে আট জনের অবস্থা খুবই গুরুতর।

ভ্যান চালকের কথা শুনে আমি একটি রিক্সা নিয়ে দ্রুত দুর্ঘটনার স্থানে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, একটি লাশ কাপড় দিয়ে ঢাকা আছে। তার সমস্ত দেহ চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে গেছে। মাথা ফেটে মগজ বের হয়ে এসেছে। পরণের কাপড়গুলো রক্তে রঞ্জিত। আমি মুখের কাপড়খানা সরিয়ে একটু ভালভাবে

তাকাতেই চমকে উঠলাম। কেননা, এ ছিলো ঐ ব্যক্তির লাশ, যে আমাকে কিছুক্ষণ পূর্বে গ্রেট বোকা আখ্যা দিয়ে মিথ্যা কথা বলে চলে এসেছিলো। ভাইজান! এ দৃশ্য দেখে লোকটির জন্য আমার বড় মায়া হলো। তবে সেই সাথে মিথ্যা বলার করুণ পরিণতি প্রত্যক্ষ করে হাদীসের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস আরো বহুগুণে বেড়ে গেলো।

ভাইজান! বাড়িতে এসে যার কাছেই এ ঘটনা শুনালাম, সেই আমাকে বললো, সত্য কথা বলার কারণেই তুমি রক্ষা পেয়েছো।

মাসুম বলল- হ্যাঁ, তাদের সাথে আমিও একমত। সত্যই আপনাকে মুক্তি দিয়েছে। বাঁচিয়ে দিয়েছে এক মহা বিপদ থেকে।

রায়হান এবার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করলো। সে বললো, হুজুর! আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি। রীতিমতো কুরআন শরীফ পড়ি। একজন মুসলমান হিসেবে ধর্মের বিধি-বিধানগুলো মেনে চলার চেষ্টা করি। সেদিন আমি নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। হঠাৎ এক পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা। বন্ধুটির নাম ইকবাল হাসান। সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর আমি তাকে বললাম, নামাজ পড়েছিস?

সে বলল, আরে নামাজ রোজা, ইবাদত-বন্দেগী করে কী হবে? তাকদীরে যা আছে তা-ই হবে। আমার ভাগ্যে ইবাদত বন্দেগী লিখাই হয় নি। ভাগ্যে থাকলে তো ইবাদত বন্দেগী করতামই।

হুজুর! আমি স্কুলের ছাত্র। ধর্মের জ্ঞান পরিপূর্ণ না থাকার কারণে আমি তাকে সন্তোষজনক কোনো জবাব দিতে পারি নি। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে এ কথা বলে বিদায় দিয়েছি যে, ইকবাল! তুমি অপেক্ষায় থাকো। আমি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই হুজুরদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জেনে তোমাকে অবহিত করবো। বিষয়টি আমার নিকটও অস্পষ্ট বিধায় তোমাকে আজ সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলাম না। এতটুকু বলে বিদায় নিয়ে চলে এসেছি। হুজুর! আজ আপনাকে পেয়ে বড় খুশি লাগছে। অনুগ্রহ করে এ ব্যাপারে আমাকে কিছু বলুন। আমার বড় ভয় হচ্ছে, না জানি আমার বন্ধুটি তাকদীরের আশ্রয় নিয়ে আমল না করেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

মাসুম এতক্ষণ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে রায়হানের কথা শুনছিল। রায়হানের কথা শেষ হলে মাসুম বললো-

হ্যাঁ, ভাই! আপনি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানতে চেয়েছেন। দুআ করুন, আল্লাহ পাক যেন আমার মুখ দিয়ে এমন কথা বের করে দেন, যদ্বারা আপনার বন্ধু এবং ঐসব লোকদের মনের খটকা দূর হয়ে যায়, যারা বলে- কপালে যা আছে, তাই তো হবে, আমল করে লাভ কি?

ভাই রায়হান! তাকদীরের কথা বলে বা তাকদীরের দোহাই দিয়ে আল্লাহ পাকের হুকুম আহকাম পালন থেকে যারা দূরে থাকতে চায় তাদের এ বক্তব্য কয়েকটি কারণে ভুল। কারণগুলো তুমি মন দিয়ে শোন। আশা করি বুঝতে পারবে।

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকদীরের প্রতি যেমন বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন, তেমনি শরিয়তের বিধানাবলি পূর্ণ পাবন্দীর সাথে অনুসরণ করতে বলেছেন। নির্দেশ দিয়েছেন নিষিদ্ধ বিষয়াবলি বর্জন করতে। এখন কথা হলো, তাকদীরের প্রতি ঈমান আনার মর্ম যদি এই হয়ে থাকে যে, এখন আর আমল করার প্রয়োজন নেই, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমল করার আদেশ দিলেন কেন? কেন বিস্তারিতভাবে শরিয়তের বিধানাবলি তুলে ধরলেন উম্মাহর সামনে? তদুপরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশেই যখন তাকদীরকে মানা হচ্ছে, তখন অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে তার হুকুমকে অমান্য করা হবে কেন? এটাই কি ঈমানদারীর পরিচয়? বিবেক কি এ কথাই বলে?

ভাই রায়হান! তাকদীর সম্পর্কে এই প্রশ্ন কোনো নতুন বিষয় নয়! হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ প্রশ্ন করেছিলেন। বলেছিলেন- তাকদীরে যখন সবকিছু স্থির করা আছে তখন আর আমল করে লাভ কি হবে? আমরা বরং তাকদীরের উপর ভরসা করে বসে থাকি।

এর উত্তরে নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমল করতে থাক। যাকে যে পথের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্যে সে পথ সহজ করে দেওয়া হবে।[২]

তাক্বদীর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই। তিনিই মানুষের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। আবার তিনিই তার নবীর মাধ্যমে ইসলামী বিধি বিধানের উপর আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই অনুগত বান্দার কর্তব্য হলো, তাকদীরের প্রতিও বিশ্বাস রাখা এবং যথাযথভাবে শরিয়তের বিধানাবলিরও অনুসরণ

২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ঃ ২০

করা। শরিয়তের বিধানাবলিকে লঙ্ঘণ করার মতলবে তাকদীরকে বাহানা হিসাবে ব্যবহার করা একান্তই বক্রতা এবং আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি জঘন্য অভিযোগের শামিল। কেননা আল্লাহ ও রাসূলের পরিষ্কার নির্দেশ হলো, তাকদীরের প্রতি ঈমান রাখো এবং আমলও করো। আর বাহানাপন্থিরা বলছে, তাকদীরে যখন সব কিছু লিখা আছেই তখন আর আমল করার দরকার কি? একি আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যারোপ করার শামিল নয়?

২. তাকদীর লিপিবদ্ধ হওয়ার কারণে তো কারো ভাল মন্দ কর্মের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হয় নি। বরং প্রতিটি মানুষই ভাল-মন্দ যা খুশি করতে পারে। আর পরকালের শাস্তি ও পুরস্কার এই ইচ্ছাধীন কর্মের উপরই নির্ভরশীল। তাই বান্দার কর্তব্য হলো, মহান আল্লাহর বিধানাবলির প্রতি লক্ষ্য রাখা ও তদানুযায়ী আমল করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকা।

কিন্তু সরল সহজ এই পথকে পরিহার করে আল্লাহ তা'আলার হুকুম বর্জন করা, তাকদীরের আড়াল ধরে নিজেকে বেকসুর নিষ্পাপ বলে প্রমাণিত করতে চেষ্টা করা একান্তই মূর্খতা এবং বোকামী। এই জাতীয় মানসিকতার ভয়ংকর পরিণতি হলো, এসব লোকের তওবা করারও সুযোগ হয় না।

৩. শরিয়তের বিধানাবলি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আশ্রয় হিসাবে তাকদীরের সাহায্য নেওয়া হয়। যারা তাকদীরের আশ্রয়ে আল্লাহ প্রদত্ত কর্তব্য থেকে পালিয়ে বেড়াতে চায়, শয়তান তাদেরকে তাকদীরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় বার বার। অথচ এই তাকদীর আশ্রয়ীরাই পার্থিব অর্থ-বিত্ত উপার্জনের নেশায় সদা ঘর্মক্লান্ত। অথচ রিজিকও তাকদীরে লিপিবদ্ধ। রিজিক ও সম্পদের ক্ষেত্রে তাকদীরের উপর ভরসা করে ঘরে বসে থাকে না। বরং নামাজ, রোজা, হজ্ব-যাকাতের ক্ষেত্রেই কেবল বাহানা দেয়া হয় তাকদীরের। আত্ম প্রবঞ্চনার এই পথ সত্যিই বড় ধ্বংসের। সত্যিই বড় বিপদের।

মাসুমের কথা শেষ হলে রায়হান বললো, ভাইজান! তাকদীরের এ ব্যাপারটি এতদিন আমার নিকটও পরিষ্কার ছিলো না। অনুরূপ প্রশ্ন আমার অন্তরেও জাগ্রতা হতো। কিন্তু আপনার বক্তব্য শুনে বিষয়টি অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন আমার মনে এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই।

ঃ ভাই! তাকদীরের ব্যাপারটি একটু জটিলই বটে। রহস্যে ঘেরা এ

বিষয়টিতে কিছুটা অস্পষ্টতা থাকতেই পারে। তবে জ্ঞানের পরিচয় হবে এটাই, এ ব্যাপারে চুলচেরা বিশ্লেষণে না গিয়ে আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করে যাওয়া।

ঃ হ্যাঁ, আপনি একশ ভাগ সত্য ও সঠিক কথা বলেছেন। দুআ করবেন, এভাবে আমল করেই যেন দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি।

এভাবে আরো অনেক কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তারা ঢাকা এসে পৌঁছে। গাড়ী থেকে নামার পর এবার পৃথক হওয়ার পালা। আসলে এ অল্প সময়ের দেখা সাক্ষাত ও কথা বার্তায় তাদের দুজনের মধ্যে এক গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। তাই বিদায় মুহূর্তে উভয়ের চোখেই পানি এসে গেলো। একটি ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দিতে দিতে মাসুম বললো, আল্লাহ পাক যেন আবার আমাদের সাক্ষাত ঘটান। 'তাই যেন হয় আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলে রায়হান তার আপন গন্তব্যের দিকে পা বাড়ালো।

[তিন]

গাড়িতে রায়হানের সাথে আলাপে মগ্ন থাকলেও মাঝে মধ্যে যে স্ত্রী নাজিয়ার সুন্দর চাঁদমুখ খানা ভেসে উঠে নি তা নয়। এখন একাকী হওয়ায় নাজিয়ার কথা আরোও বেশি মনে পড়তে লাগলো।

রাত তখন নয়টা। মাসুম বাস থেকে নেমে একটি সিএনজি নিয়ে দ্রুত বেফাক অফিসে পৌঁছল। খাতা-পত্র ইত্যাদি বুঝিয়ে দিয়ে সে যখন অফিস থেকে বের হলো তখন ঘড়ির কাটা দশটা ছুঁই ছুঁই। সে ভাবলো, এত রাতে বি. বাড়ীয়ার বাস পাব না। সিলেট গামী নাইট কোচেই যেতে হবে। তাই সে রিক্সা নিয়ে সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে এসে বাসে চড়ে বসলো।

সেদিন বাসে বেশি যাত্রী ছিলো না। সময় হয়ে গেলে বাস ছেড়ে দিলো। রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা কম থাকায় অতি দ্রুত ছুটে চললো সিলেটগামী 'মিতালী' বাসখানা।

গাড়ী বিরামহীনভাবে চলছে। যাত্রীদের অনেকেই ইতোমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাসুমের চোখে ঘুম নেই। সে নাজিয়ার কথা চিন্তা করছে। তার মনে কেবল একটা কথাই বারবার উদয় হচ্ছে, আহা! বেচারী নাজিয়া বোধ হয় এখনো ঘুমায় নি। নিশ্চয়ই সে অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে না খেয়ে আমার অপেক্ষায় বসে আছে। আশা করছে, আমাকে নিয়ে একত্রে এক প্লেটে খানা খাবে। আমি তাকে কত করে বললাম, নাজিয়া! রাতে আসতে দেরি হলে তুমি খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। আমরা পুরুষ মানুষ। অনেক সময় বিভিন্ন ঝামেলায় বাসায় ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়। যদি আমার অপেক্ষায় বসে থাকো, তবে অনেক কষ্ট হবে। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়বে।

কিন্তু একথা সে মানে নি। মানতে পারে নি। স্বামীর প্রতি তার অকৃত্রিম ভালবাসা, অসীম প্রেম ও অফুরন্ত হৃদয়ের টানই তাকে ঘুমুতে দেয় নি, খেতে দেয় নি একা একা। রাত যত গভীরই হোক না কেন, সময় যত বেশিই হোক না কেন, কোনো দিন তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পাই নি। পেয়েছি তিলাওয়াতে। পেয়েছি মোনাজাতে, পেয়েছি ধর্মীয় কোনো পুস্তক পাঠে। হায়! আমার কলিজার টুকরা হৃদয়ের রাণী নাজিয়া এখনো আমার জন্য নির্ঘুম অবস্থায় জেগে আছে।

হঠাৎ একটি বিকট আওয়াজ হয়। গাড়ীখানা প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যায়। ঘুমন্ত যাত্রীরা হকচকিয়ে জেগে উঠে। কি ঘটেছে, কেন এমন হলো, কিছুই বুঝতে পারে না তারা। সবাই নিজ নিজ আসনে বসে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে থাকে।

গাড়ীটি তখন মাধবদী থেকে এক কিলোমিটার দূরে একটি নির্জন এলাকায়। আশে পাশে কোন বাড়ি ঘর নেই। শুধু হেড লাইটের আলোতে রাস্তা থেকে বেশ দূরে একটি দেয়াল চোখে পড়লো। এতক্ষণে লোকজন বুঝতে পারলো, গাড়ীর পিছনের চাকা ব্রাষ্ট হয়ে গেছে। সেই সাথে এও জানলো যে, ভুল ক্রমে প্রয়োজনীয় তেলও আনা হয় নি।

নতুন চাকা সংযোজন ও তেল আনতে কতক্ষণ লাগবে একথা ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, কমপক্ষে দেড় দুই ঘন্টা তো লাগবেই। কারণ তেলের জন্য মাধবদী যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

নিঝুম রাত। যানবাহন চলাচল প্রায় থেমে গেছে। মাঝে মধ্যে দু'একটা দূরপাল্লার বাস এদিক থেকে সেদিকে চলে যাচ্ছে। যন্ত্রদানব নামে খ্যাত কিছু

কিছু মালবাহী ট্রাকও চলাচল করছে।

গাঢ় অন্ধকার হওয়ায় আশে পাশে কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। যারা বাস থেকে নেমে ছিলো, দু'একজন সাহসী যাত্রী ছাড়া বাকিরা সবাই নিজ নিজ আসনে বসে ঘুমাতে লাগলো। মাসুমও ঘুমাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। কেবলই তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো নাজিয়ার ফুটফুটে সুন্দর মুখ খানা।

নাজিয়ার বয়স বিশ। তার দেহরত্ন অপরূপ যৌবন গরিমায় লাবণ্যমন্ডিত। প্রস্ফুটিত গোলাপের সুরভিত সুষমায় তার অবয়ব যেন অপার্থিব মহিমায় গৌরবান্বিত। সুন্দরীর আঁখি যুগলের বাঁকা চাহনি প্রেমাস্পদের হৃদয় তলে মায়াবাণ নিক্ষেপ করতে বেশ দক্ষ। তার অনুপম গঠন স্বামীর মন প্রাণ হরণ করে প্রেমের মূর্ছনা জাগিয়ে তুলে। টুকটুকে লাল পাতলা ওষ্ঠযুগলে সব সময় লেগে থাকে হাসির রেখা। কোনো সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যেন যুবতীর উন্নত নাসিকাখানা তৈরি করা হয়েছে। কবি সাহিত্যিকরা তাকে পেলে সুকেশী, সুদন্তী, সুনয়না, সুদর্শনা, অনন্যা ও নিরভিমানী ছাড়াও কতশত গুণবাচক শব্দে অভিহিত করতেন তার কোনো হিসেব নেই।

নাজিয়াকে নিয়ে এসব চিন্তা করতে করতে প্রায় অর্ধ ঘন্টা চলে গেলো। মনটা কেমন জানি ছটফট করছে মাসুমের। কোনো কিছু ভালো লাগছে না তার। এক পর্যায়ে সে বাস থেকে নেমে পড়ে। ঝিরঝির করে বাতাস বইছিলো। নাজিয়ার কথা কল্পনা করতে করতে সামনে হাঁটতে থাকে। হারিয়ে যায় সে ভাবনার সাগরে। এভাবে যেতে যেতে বাস থেকে বেশ দূরে চলে আসে সে। নীরব-নিস্তব্ধ গহীন রাতে এভাবে একা একা চলা নিরাপদ নয়, কল্পনার জগতে ডুব দিয়ে একথাও সে বেমালুম ভুলে গেলো।

অকস্মাৎ একটি মেয়েলি কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পেয়ে মাসুম থমকে দাঁড়ায়। এদিক সেদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। কর্ণদ্বয় সজাগ করে চপলা হরিণের ন্যায় পুনরায় বাম দিকে মুখ ফিরাতেই আবার ভেসে এলো একটি করুণ আর্ত-চিৎকার বাঁ-চা-ও। কে আছো? আমাকে বাঁ-চা-ও.....।

মাসুমের সন্ধানী দৃষ্টি ফিরতে থাকে ডানে, বামে। কিন্তু না, দৃষ্টির সীমানায় কিছুই সে দেখতে পেল না। আবার শোনা গেল বাঁ-চা-ও! বাঁ-চা-ও.....।

নিজের অজান্তেই মাসুমের হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ হয়। সে আর স্থির থাকতে পারে না। শব্দের রেশ ধরে চলতে চলতে যখন একটি ভগ্ন দেয়ালের কাছে পৌঁছে, তখন সে দেখতে পায় তিনটি যুবক একটি মেয়েকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। আর মেয়েটি কেবল তাদের কাছে হাত জোড় করে বলছে- তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা আমার ভাই। আমার সব কিছু নিয়ে যাও। কিন্তু আমার সতিত্ব হরণ করো না।

মাসুম একা। নিরস্ত্র। ওরা তিনজন। সাথে নিশ্চয় অস্ত্র আছে। সে ভাবে, সে কি পারবে মেয়েটিকে বাঁচাতে? না কি নিজেরও প্রাণ দিতে হবে মেয়েটিকে বাঁচাতে গিয়ে। আবার ভাবে, আমার সামনে একটি মেয়ের সম্ভ্রমহানি হবে এ কি করে হয়? যদি খোদা না করুন, এ মেয়েটি যদি আমার স্ত্রী বা বোন হতো, তবে কি আমি পারতাম এভাবে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে? না, এ মুহূর্তে এত ভাবনার সময় নেই।

এমন সময় কে যেন তার ভেতরকার ব্যক্তিটাকে বলে দিয়ে যায়, মাসুম! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছো? এখন সময় নেই। তোমার জীবন দিয়ে হলেও মেয়েটিকে রক্ষা করো। অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন।

মেয়েটির আর্ত-চিৎকার পাষণ্ডদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে নি। ভাই সম্বোধনেও তাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দয়ার উদ্রেক হয়নি। তাদের একজন মেয়েটির মুখে রুমাল ঢুকিয়ে দেয়। আর বাকি দু'জন হাত পা শক্ত করে ধরে রাখে।

এ দৃশ্য দেখে মাসুমের পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হলো না। সে আল্লাহর নাম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো যুবকদের উপর। মাসুমের অযাচিত আক্রমণে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যুবকত্রয় মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে মাসুমের উপর একযোগ ঝাঁপিয়ে পড়লো। মাসুম খানিক সরে গিয়ে তাদের আক্রমণ থেকে নিজকে রক্ষা করে অতি ক্ষিপ্রতার সাথে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো আক্রমণকারীদের উপর। মাসুম আত্মরক্ষার জন্য কারাত প্রশিক্ষণ গত তিন মাস হয় শেষ করেছে। সে প্রশিক্ষণই এবার সে বাস্তবে প্রয়োগ করতে লাগলো। হাত পা ছুঁড়তে লাগলো বাতাসের গতিতে। যুবকত্রয় আর সামনে দাঁড়াতে পারলো না। প্রাণ নিয়ে দৌড়ে পালালো। যাবার সময় শুধু এতটুকু বলে গেলো -উড়ে এসে জুড়ে বসেছো? সুযোগ পেলে দেখিয়ে দেব কত ধানে কত চাল। আর মনে রেখো, আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তুমি যে অন্যায় করেছো, তার শাস্তি তোমাকে ভোগ করতেই হবে একদিন।

লম্পটদের চলে যাওয়ার পর মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়। এক পা দু'পা করে এগুতে থাকে মাসুমের দিকে। মাসুম দৃষ্টি নিচু করে পরম স্নেহের সাথে জিজ্ঞেস করে-

ঃ বোন! কে আপনি? কোথায় যাবেন? চলুন আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

ঃ আমার নাম ফারহানা আক্তার নাজিয়া। আমি মামার বাসায় থেকে বি.বাড়ীয়া সরকারী কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। মামার বাসা শহরের মধ্যপাড়ায়। আর ঐ গ্রামে আমাদের নিজ বাড়ি। ফারহানা তার গ্রামের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে। তারপর বলে, আপনার পরিচয়টা একটু দেবেন কি?

'নাজিয়া' নামটা শুনে মাসুমের মনটা মোচড় দিয়ে উঠে। আবার স্মরণ হয় বেচারীর কষ্টের কথা।

ঃ হ্যাঁ, পরিচয় অবশ্যই দেবো। তবে তার আগে বলুন, আপনি কিভাবে এ বিপদের সম্মুখীন হলেন।

ঃ সে অনেক কথা। চলুন বাসায় গিয়ে সব বলবো।

ঃ বাসায় গিয়ে শোনার মতো সময় আমার হবে না। আমাদের বাস অল্প সময় পরেই ছেড়ে দিবে।

ঃ ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে কৃতজ্ঞ হতাম।

ঃ ব্যাপার হলো, আমরা বাস যোগে বাড়ি ফিরছিলাম। পথিমধ্যে চাকা নষ্ট ও তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই আমাদেরকে থামতে হলো। ড্রাইভার বলেছে, দেড় দু'ঘন্টার মধ্যেই সব ঠিক ঠাক হয়ে যাবে। ইতোমধ্যেই প্রায় এক ঘন্টা চলে গেছে।

ঃ ও থাক্ থাক্। আমি আর আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না। আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন, এজন্য চিরদিন আপনার নিকট ঋণী হয়ে থাকবো। এবার অনুগ্রহ করে আপনার ঠিকানাটা দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

ঃ আমার নাম মাসুম। বাড়ি, সদর বি.বাড়ীয়ার কাজীপাড়া এলাকায়। আমি এক মাদরাসায় শিক্ষকতা করি।

ঃ আপনার ফোন নম্বরটা একটু দিলে ভাল হতো।

এতক্ষণে তারা ফারহানাদের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। মাসুম

ফোন নম্বর সংম্বলিত একটি ভিজিটিং কার্ড ফারহানার হাতে তুলে দেয়। তারপর বলে, আপনি কিন্তু বিপদের কারণটা এখনো বলেন নি।

ঃ 'ও তাই তো' বলে ফারহানা বলতে থাকে, আপনি হুজুর মানুষ। আপনার কাছে কথাটা বলতে যদিও লজ্জা লাগছে তারপরও বলতে হচ্ছে। কারণ আমার প্রতি আপনি এমন এক অনুগ্রহকারী যার কথা প্রত্যাখান করা যায় না। আপনি নিজের জীবনের পরওয়া না করে আমার ইজ্জতই হিফাজত করেননি, জীবনও বাঁচিয়েছেন।

ঃ বলতে সংকোচবোধ করলে বলার প্রয়োজন নেই। আর আপনি যে বলেছেন, আমি আপনাকে বাঁচিয়েছি এ কথাটি ঠিক নয়। কারণ কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে না। বাঁচানোর মালিক একমাত্র আল্লাহ। মানুষ শুধু উসিলা মাত্র। আপনাকে বাঁচানোর জন্য, আপনার ইজ্জত রক্ষার জন্য, আল্লাহপাকই আমাকে উসিলা হিসাবে পাঠিয়েছেন।

ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে। ভুল শোধরে দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ফারহানা এতক্ষণ একটি ব্যাপার খুব ভাল করে লক্ষ্য করছে। সে খেয়াল করে দেখেছে যে, মাসুমের সাথে প্রথমবার চার চোখের মিলন হওয়ার পর এ পর্যন্ত একবারও সে ফারহানার দিকে চোখ তুলে তাকায় নি। এমনকি আড় চোখেও নয়। ব্যাপারটি তাকে ভাবিয়ে তুলে। সে চিন্তা করে, এতদিন আমি হুজুর মাওলানাদের শুধু শুধুই খারাপ জানতাম। অথচ আজকের ঘটনা প্রমাণ করল, হুজুররা কত মহৎ! কত উদার!!

এতক্ষণে তারা গন্তব্যে চলে আসে। মাসুম ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে আমাকে এক্ষুণি ফিরতে হবে। দেরি করলে বাস চলে যাবে।

ঃ একি? আপনি কি একটু চাও খাবেন না? তাছাড়া আমার মূল কাহিনীও তো বলা হলো না।

ঃ আপনার আবদার রক্ষা করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আপনার মামার বাসা মধ্যপাড়া আর আমার বাসা কাজীপাড়া। মধ্যপাড়া-কাজিপাড়া তো পাশাপাশি স্থান। মামার বাড়ীতে যাওয়ার পর একদিন সুযোগ করে ফোনে জানিয়ে বাসায় আসবেন। তখন কাহিনীও শোনা যাবে গৃহিণীর সাথেও পরিচিত হবে।

ঃ আচ্ছা ঠিক আছে। অবশ্যই আমি আপনাদের বাসায় বেড়াতে যাবো।

ঃ এরূপ ক্ষেত্রে 'ইনশাআল্লাহ' বলতে হয়। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন কাজের ইচ্ছা ব্যক্ত করার সময় 'ইনশাআল্লাহ' (যদি আল্লাহ চান) কথাটি জুড়ে দিতে হয়। কেননা আল্লাহপাক না চাইলে শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেউ কিছু করতে পারবে না।

ঃ 'ইনশাআল্লাহ, কলেজ খুললে মামার বাসায় যাওয়ার পর আপনাদের বাসায় বেড়াতে যাবো। এবার হলো তো?

ঃ হ্যাঁ। এবার হয়েছে। মনে কিছু নিবেন না। একজন যা জানে তা অপরকে বলে দেওয়া এটা ইসলামেরই বিধান। তাই আপনাকে বলে দিলাম।

ঃ না, আমি বরং খুশি হয়েছি। আমার মনে হয় আপনার স্ত্রীও দ্বীনদার মেয়ে। আমি মুসলমান ঠিকই, কিন্তু মুসলমানীর কিছুই বুঝি না আমি। ছোট বেলা থেকেই অন্য পরিবেশে লালিত পালিত হয়েছি। কেউ আমাকে এসব বলেও নি, শিখায়ও নি। আমার মনে হয়, আপনাদের সংস্পর্শে থাকলে ধর্মের ব্যাপারে অনেক কিছু আমিও শিখতে পারবো। আমার জন্য খাস করে দুআ করবেন।

ঃ ঠিক আছে অবশ্যই করবো বলে মাসুম ফারহানাকে বাড়ির ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে বাসের দিকে পা বাড়ালো।

[চার]

রাত তখন ১২টা। নাজিয়া তার স্বামীর অপেক্ষায় অপেক্ষমান। সে আজ সবচেয়ে সুন্দর কাপড় পরিধান করেছে। স্বামীর জন্য মনের সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে সাজগোজ করেছে। চুলে তেল দিয়ে সুন্দর করে আঁচড়িয়ে বেণী করে নিয়েছে। হাতে পায়ে টিউব মেহেদী ব্যবহার করেছে। ওষ্টদ্বয়কে কাপড়ের সাথে ম্যাচিং করে লিপস্টিক দিয়ে রাঙ্গিয়ে তুলেছে। মুখে স্নো দিয়েছে। হাতে কানে ও গলায় অলংকার পরিধান করেছে। মিছওয়াক করে উত্তমরূপে দাঁত পরিষ্কার করে নিয়েছে। গোসলের সময় উত্তম রূপে গোটা দেহ সাফাই করেছে। মোটকথা স্বামী মাসুমকে খুশি করার জন্য সাজ সজ্জার কোনোটিই বাকি রাখে নি সে।

নাজিয়া একজন পতিপ্রাণা স্ত্রী। পৃথিবীর সকল স্ত্রীর জন্য সে যেন একটা আদর্শ। স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য বৈধ সবকিছুই সে করে। দাম্পত্য জীবনের চার বছরের মধ্যে একদিনও এমন হয় নি যে, স্বামী সফর থেকে ফিরে এসে তাকে নববধূর ন্যায় সজ্জিত অবস্থায় পায় নি। তাছাড়া প্রতিদিন রাতে পরিপাটি হয়ে আকর্ষণীয় রূপ ধারণ করে স্বামীর বিছানায় যাওয়া তার নিয়মিত অভ্যাস। উপরন্ত স্বামীর উপস্থিতিতে দিনের বেলায়ও রূপ চর্চায় তার ভুল হয় না। অর্থাৎ তখনও সে যথাসম্ভব পরিপাটি হয়ে থাকার চেষ্টা করে। স্বামীর সাথে সর্বদা হাসিমুখে কথা বলে। তাকে সে মাথার তাজ ও সর্বাধিক শ্রদ্ধা পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি বলে মনে করে। কখনো কোনো ভুল করে ফেললে কিংবা কোনো কথা বা কাজের দ্বারা স্বামী কষ্ট পেয়েছেন মনে করলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে নেয়। স্বামীর বিরোধিতা করাকে সব সময় সে এড়িয়ে চলে। তার দেওয়া সামান্য উপহারকেও সে আনন্দচিত্তে গ্রহণ করে। সর্বোপরি স্বামীর সেবা ও খেদমতকে সে জীবনের প্রধান কাজ বলে মনে করে।

রাত বাড়তে থাকায় নাজিয়া চিন্তিত হয়। এতক্ষণ সে কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল ও ধর্মীয় বই পড়ে কাটিয়েছে। এবার সে দু'রাকাত নামাজ পড়ে মোনাজাতের জন্য হাত উঠিয়েছে। সে কেঁদে কেঁদে বলছে- আয় পরওয়ারদিগার! তুমি অনাদি, অনন্ত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। অসীম করুণাময় তুমি। ওগো দয়ার সাগর! তুমি আমার স্বামীকে যাবতীয় বিপদ থেকে হিফাজত করো। তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য ভাল রাখো। অতি নিরাপদে আমার বুকে তাকে ফিরিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমি রাহমান, তুমি রাহীম। তোমার দয়ার কোন অন্ত নেই, শেষ নেই। তুমি মেহেরবানী করে আমার কলিজার টুকরা স্বামীকে ডানে, বামে, উপরে, নিচে, সব দিক দিয়ে হেফাজত করো।

দুআ শেষে নাজিয়া বললো, হে প্রভু! যদি আমার স্বামী আজ রাতে সুস্থাবস্থায় ফিরে আসে তবে আমি শুকরিয়া স্বরূপ পাঁচটি রোজা রাখবো। একথা বলে সে আবার কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন হলো।

[পাঁচ]

ফারহানাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে মাসুম গাড়িতে এসে বসলো। এতক্ষণে গাড়ি সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে গেছে। ড্রাইভার তার আসনে বসে বিসমিল্লাহ বলে গাড়ি স্টার্ট দিলো। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করলো গাড়ি।

মাসুম যখন বাসায় পৌঁছল তখন রাত আড়াইটা। বাসার পাশেই ছিল একটি জামে মসজিদ। মাসুম প্রথমে বাসায় না গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলো। তারপর সফর থেকে ফিরার সুন্নত হিসেবে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করে বাসার দিকে পা বাড়ালো।

এ সময় মাসুমের মনে সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের আরেকটি সুন্নতের কথা মনে পড়লো। দূর দূরান্তের সফর থেকে অনেক দিন পর বাড়িতে আসলে ঘরে প্রবেশের কিছুক্ষণ পূর্বে ঘরের লোকদেরকে আগমনের সংবাদ জানিয়ে দেওয়া। যাতে স্ত্রী তার স্বামীর জন্য সাজসজ্জা করে পরিপটি হয়ে নিতে পারে।

মাসুম ভাবলো, এ সুন্নতটিতো আমি দুপুরেই আদায় করেছি। তবে একথা ভেবে সে ভীষণ কষ্ট পেল যে, সে কেন রাতের বেলা একটু ফোন করে স্ত্রীকে জানিয়ে দিতে পারলো না যে, আমার আসতে একটু দেরি হবে। তাহলে নাজিয়ার কোনো পেরেশানী হতো না।

আসলে ফোনের ব্যাপারে মাসুমকেও দোষ দেওয়া যায় না। কেননা সায়েদাবাদ বাসষ্ট্যান্ড এসে সে ফোন করতে চেয়েছিলো। ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে প্রবেশ করতেই দেখলো- বাস ছেড়ে দিয়েছে। তাই ফোন আর করা গেলো না। বাধ্য হয়েই দৌড়ে এসে বাসে উঠতে হলো।

রাতের বেলা মাসুম দেরি করে বাসায় ফিরে না। কারণ সে জানে, যতক্ষণ সে না যাবে ততক্ষণ নাজিয়া খাওয়া কিংবা ঘুম কোনোটাই করবে না। মাঝে মধ্যে বিশেষ কোনো কারণে বাসায় ফিরতে বিলম্ব হলেও কোনোদিন বারটার উপরে যায় নি। এখন রাত আড়াইটা বাজে। মাসুম ভাবে, আজ হয়তো নাজিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। একটি মেয়ে কি এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারবে? মাসুম ধীরে ধীরে তার কামরার সামনে এসে দাঁড়ায়। আস্তে করে ডাকে- নাজিয়া!

নাজিয়া তখন ক্ষীণ আওয়াজে সূরায়ে মূলক্ তিলাওয়াত করছিলো। ডাক শুনেই সারা দেহ-মন পুলকিত হয়ে উঠলো। এ আওয়াজ তার শুধু পরিচিতই নয় একান্ত কাম্য, আরাধ্য, চিত্তবিনোদক। এ তো তার পরম প্রিয়ের কণ্ঠস্বর। এ মধুর ডাক তার হৃদয়ে কেড়ে নিলো। অন্তর জুড়ে বয়ে চললো এক আনন্দময় অনুভূতি।

নাজিয়া দ্রুত দরজা খুলে দেয়। তার দুআ কবুল হওয়ায় মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। অনাবিল এক আনন্দে আপ্লুত হয় তার হৃদয়-মন। চোখের কোনায় জমে উঠে আনন্দ-অশ্রু।

দরজা খোলার সাথে সাথে নাজিয়া 'আসসালামু আলাইকুম' বলে স্বামীকে হাতে ধরে ঘরে নিয়ে আসে। মাসুম 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলে ঘরে প্রবেশ করে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকে নাজিয়ার ফুটফুটে কমনীয় মুখখানির দিকে। তার আলোকোজ্জ্বল চেহারা ও কাঁচা হলুদবর্ণের গা থেকে চারিদিকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন।

উদ্ভিন্ন যৌবনা নাজিয়া। চাঁদের মতো মুখখানি লাইটের ক্ষীণ আলোকে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তার গোলাপী চেহারার রক্তিম গন্ড বুঝি ফুলের পাপড়ীকেও হার মানাবে। মাসুম অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে। দেখছে তাকে অন্তর ভরে। দীর্ঘ কাজলা আঁখিদ্বয় যেন বিজলী বিকিরণ করছিলো।

স্বামীকে এমন করে চেয়ে থাকতে দেখে নাজিয়া স্বর্গীয় হুরীদের মতো এক দিলখোলা হাসি হেসে বলে- প্রিয়তম! এমন করে কী দেখছেন?

ঃ দেখছি তোমাকে, দেখছি সৌন্দর্যের রাণীকে।

ঃ আমি বুঝি খুব সুন্দর?

ঃ তুমি শুধু সুন্দরই নও, তোমার রূপ লাবণ্যে চাঁদেরও ঈর্ষার উদ্রেক হয়।

ঃ তাই নাকি?

ঃ অবশ্যই।

ঃ আমাকে গভীরভাবে ভালোবাসেন বলেই আপনার চোখে আমি এতো সুন্দর।

ঃ তা তো বটেই। তবে তুমি আসলেই সুন্দর। একথা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।

ঃ আমি সুন্দরী কি না জানি না। তবে আপনার চোখে আমি সুন্দরী বলে বিবেচিত হতে পেরেছি এটাই আমার জীবনের পরম পাওয়া।

ঃ নাজিয়া! তুমি সুন্দরী, হুরী, রূপরানী, লাবণ্যময়ী, কান্তিময়ী।

ঃ ঠিক আছে মানলাম। এবার বলুন, আপনি কেমন আছেন? আসতে এত

www.smfoundationbd.com

বিলম্ব হলো কেন? এতোদিন কিভাবে কাটালেন? পথিমধ্যে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?

ঃ খোদার ফজলে ভাল আছি। তুমি কেমন আছো?

ঃ আমিও ভাল আছি। তবে এ ১০/১২ দিনে অনুভব হয়েছে স্বামী যার ঘরে নেই, তার মতো দুখিনী বুঝি জগতে কেউ নেই।

ঃ আমার অবস্থাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। পাবনায় যাওয়ার পর থাকা-খাওয়ায় কোনোই কষ্ট হচ্ছিল না। শরীর স্বাস্থ্যও ভালো ছিলো। তবে শরীরের দিকটি ভাল থাকলেও মন কিন্তু আমার ভালো ছিলো না। এর কারণ তোমার অনুপস্থিতি। তোমাকে কাছে না পাওয়ার এক অব্যক্ত বেদনা সর্বদাই আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিলো। আমি যেখানে ছিলাম সেখানে কোনো ফোনের দোকান ছিলো না। শহর ছিলো প্রায় ৮/১০ কিলোমিটার দূরে। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও চাহিদা অনুসারে ফোন করতে পারি নি। অবশেষে অস্থিরতার মাত্রা যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন অনেক কষ্ট করে শহরে গিয়ে তোমার নিকট ফোন করি। এতে মনটা অনেক পাতলা হয়। এর পরের দিন অন্য একজন লোকের মাধ্যমে কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠানোর জন্য একটি চিঠি দিয়েছিলাম। সেই চিঠিখানা পেয়েছো কি?

ঃ হ্যাঁ, পেয়েছি।

ঃ কেমন লাগলো চিঠি পড়ে? অনুভূতিটুকু শুনাবে কি?

ঃ অবশ্যই শোনাবো। তবে এর আগে আপনার আসতে বিলম্ব হওয়ার কারণটা শুনতে পারলে খুশি হবো।

ঃ ঠিক আছে, শোন তাহলে বলে মাসুম পথিমধ্যে ঘটে যাওয়া পুরো ঘটনা স্ত্রীর নিকট সবিস্তার বর্ণনা করল।

মাসুম যখন কথা বলছিল তখন স্ত্রী নাজিয়া নিজের হাতে স্বামীর পাঞ্জাবীখানা খুলে হ্যাংগারে ঝুলিয়ে রাখে। এ সময় বিদ্যুৎ চলে গেলে সে হাত পাখা দিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস করতে থাকে। মাসুমও এ সুযোগে.....। অল্পক্ষণ পরে বিদ্যুৎ চলে আসে। মাসুম জিজ্ঞেস করে-

ঃ নাজিয়া! এখনো ঘুমাওনি কেন?

ঃ বারে! আপনি এতোদিন পরে, এতো দূর থেকে, এতো কষ্ট করে আসছেন আর আমি কি-না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

ঃ এভাবে রাত জাগলে তো স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে।

ঃ হোক তাতে আমার আপত্তি নেই। আপনার খেদমত করে, আপনার সেবা করে এক কথায় আপনার জন্য স্বাস্থ্য কেন জীবনও যদি চলে যায় তবু আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে করবো। যে স্ত্রী স্বামীর জন্য কষ্ট স্বীকার করে না, তার খেদমত ও সন্তুষ্টি অর্জনকে আপন জীবনের প্রধান কাজ মনে করে না, যে স্ত্রী স্বামীর শরিয়তসম্মত আদেশ-নিষেধ মেনে চলে না, বরং উল্টো উঠতে বসতে স্বামীকে কষ্ট দেয়, আমি মনে করি, এমন নারী স্ত্রী নামের কলঙ্ক। বিশ্বাস করুন, আমি যেদিন এ সম্পর্কিত হাদীসগুলো কিতাবে পেয়েছিলাম সেদিন থেকেই নিয়ত করেছিলাম- আমি আমার স্বামীকে এতো ভালোবাসব, এতো বেশি খেদমত করবো, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এতো বেশি চেষ্টা চালাবো যার নজির বর্তমান পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

মাসুম নির্বাক, নিস্পন্দ। কোনো কথা সে বলতে পারে না। তার সমস্ত দেহমনে একটা শিহরণ নাড়া দিয়ে যায়। মাসুম সংযত রাখতে পারে না নিজকে। গভীর আবেগে নাজিয়াকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে। ওর মুখ খানা তুলে ধরে নিজের মুখের কাছে। তারপর বলে-

নাজিয়া! সত্যি তোমার অন্তরের অনুভূতি বরফের চেয়েও ঠান্ডা। গভীর তোমার প্রীতিবোধ। তোমার স্বচ্ছ হৃদয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

স্বামীর বলিষ্ঠ হাতের ছোঁয়ায় নাজিয়ার সমস্ত দেহটা যেন অবশ-শিথিল হয়ে আসে। শিরায় শিরায় বয়ে যায় এক অপূর্ব আনন্দদ্যুতি। ভাব-বিহ্বল নাজিয়ার চোখ দুটি মুদে আসে আপনা আপনি। বলে- ওগো! বড় দুষ্ট তুমি!

নাজিয়া তার স্বামীকে কখনোই 'তুমি' বলে যেমন সম্বোধন করে না তেমনি ঘরে আসার সাথে সাথে কিছুক্ষণ স্বামী-স্ত্রীসুলভ আচরণ সেরে খানা-পিনার কথা জিজ্ঞেস করতেও ভুলে যায় না। কিন্তু আজ? আজ বেশ কয়েকদিন পর স্বামীকে কাছে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যের দরুণ রুটিন মাফিক কর্মের অনেক কিছুই ওলট পালট হয়ে যায়। ভুলে যায় খানা-পিনার কথা জিজ্ঞেস করতেও।

নাজিয়ার যখন স্বামীর খানার কথা স্মরণ হয় তখন আফসোস করতে করতে বলে- হায়! এখনো আপনাকে খাবারের কথাই জিজ্ঞেস করি নি। অথচ আপনার জন্য আমি অনেক কিছু রান্না করে রেখেছি। চলুন খাবার খেয়ে নেই। আমারও ক্ষিধে পেয়েছে।

নাজিয়ার গভীর স্বামীপ্রীতি দেখে মাসুম আবারও মুগ্ধ হয়। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তার জন্য দুআ আসে। অস্ফুট স্বরে বলে- ওগো প্রেমময় খোদা! স্বামী স্ত্রীর মাঝে এ প্রেম, এ ভালবাসা তুমিই সৃষ্টি করেছো। হে আল্লাহ! তুমি আমার নাজিয়াকে কবুল করো। তাকে পবিত্র জীবন দান করো। নসীব কর জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ স্থান।

স্ত্রীর কথার জবাবে মাসুম বলে- নাজিয়া! তুমি কি এখনো খাও নি?

ঃ না, খাই নি। ভেবেছি, আপনি এলে একত্রে খানা খাবো। খাবার সব রেডী আছে। চলুন খেতে যাই।

মাসুম-নাজিয়া বেশির ভাগ সময় একত্রে খানা খায়। তাহের-তামান্না জেগে থাকলে তারাও সাথে বসে। সবাই একত্রে খাওয়ার জন্য মাসুম অনেক দিন আগে বড় একটি প্লেট বাজার থেকে কিনে এনেছে। এখন তাহের-তামান্না ঘুমিয়ে থাকায় ওরা দু'জনই এক প্লেটে খেতে বসে।

খানা শুরু করার দুআ পাঠ করে লোকমা মুখে দেওয়ার সময় নাজিয়া বলে-

আজ খানা পাকানোর সময় একটি প্লান করেছিলাম।

ঃ কি প্লান করেছো? বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করে মাসুম।

ঃ না, তেমন কিছু নয়। ইচ্ছা করেছিলাম, আজ রাতে আপনি এলে আমি আপনাকে খাইয়ে দেব আর আপনি আমাকে খাইয়ে দিবেন।

ঃ ওহ! চমৎকার ইচ্ছা। এখনই ইচ্ছার বাস্তবায়ন হোক। এ বলে মাসুম তার প্রথম লোকমাটি নাজিয়ার মুখে তুলে দেয়। নাজিয়াও লোকমা তুলে দেয় স্বামীর মুখে। এভাবেই শেষ হয় তাদের খাবার পর্ব। ওহ! কি অপূর্ব দৃশ্য!!

মাসুম স্ত্রীর সাথে কথা-বার্তার এক পর্যায়ে পিতা-মাতা ও ছেলে-মেয়েদের খোঁজ খবর নেয়। তাদের হাল হাকীকত জিজ্ঞেস করে। নাজিয়া সন্তোষজনক জবাব দেয়। বলে, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহপাকের অপার কৃপায় সবাই ভাল আছে। কারো কোনো অসুখ বিসুখ হয় নি। আম্মা আব্বা সন্ধ্যার দিকে খালেদদের বাসায় গিয়েছিলেন। ফিরেছেন রাত দশটায়। আপনি আসবেন শুনে অনেকক্ষণ তারা জাগ্রত ছিলেন। অবশেষে বিলম্ব দেখে অনেক পেরেশানী নিয়ে এতক্ষণে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন।

মাসুম বাসায় এসে যখন দেখলো, আব্বা আম্মা ঘুমিয়ে গেছেন, তখন তাদেরকে জাগিয়ে তোলা সমীচীন মনে করলো না। ভাবলো, বুড়ো মানুষ। আরাম করে ঘুমিয়েছেন। ডাকলে কষ্ট হবে।

মাসুমের বয়স বেশি নয়। বড়জোড় আটাশ/উনত্রিশ হবে। বয়স কম হলেও এলাকায় তার দারুণ সম্মান। সকলেই তাকে সমীহ করে, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়। মাসুমকে ছাড়া যেন কোনো দ্বীনি প্রোগ্রামের কথা ভাবতেই পারে না তারা।

মাসুম-নাজিয়ার সেদিনের রাতটি খুব আনন্দের মধ্যে কেটে যায়। রাতের বাকি অংশটুকুর মধ্যে কতটুকু তারা ঘুমিয়েছিলো, তারাই তা বলতে পারবে।

- - -

[ছয়]

মাসুম পাবনা থেকে যে চিঠিখানা পাঠিয়েছিলো তাতে লেখা ছিলো-

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। ওগো মোর প্রাণ সজনী! পত্রের প্রথমে আমার একবুক ভালোবাসা গ্রহণ করো। আশা করি বিধাতার অসীম করুণায় বাসার সবাইকে নিয়ে ভালো আছো। আমিও তোমাদের দুআয় একরকম ভালো।

জানো নাজিয়া! তোমাদের দুআয় অতি সহজে পাবনা এসে পৌঁছেছি। আমার সাথে আরেকজন সহযোগী নেগরান আছেন। তিনি অত্যন্ত অমায়িক মানুষ। বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায়। এই পাঁচ ছয় দিনে তার সাথে অনেকটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমি প্রধান নেগরান হলেও বয়সে কিছুটা বড় হওয়ায় তার পরামর্শ নিয়েই সব কাজ করি। গতকাল পর্যন্ত তোমার জন্য মনটা খুব অস্থির ছিলো। ফোনে তোমার সাথে আলাপ করার পর অস্থিরতা সামান্য কমেছে কিন্তু পুরোপুরি কমে নি। মাঝে মধ্যে মনে হয়, যদি পাখা থাকতো তবে আকাশে উড়ে তোমার কাছে চলে যেতাম। দুআ করো সহি সালামতে যেন তোমার নিকট পৌঁছতে পারি।

সোহাগী স্ত্রী আমার! যতক্ষণ আমি তোমার পাশে থাকি ততক্ষণ তোমার ভালবাসা, প্রেম ও অকৃত্রিম মহব্বতের পরশ আমাকে শারীরিক-মানসিক

সবদিক দিয়ে সতেজ রাখে। তুমি হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করো, তুমি পাশে থাকলে হাজার পাহাড় আর লাখো দরিয়ায় ঝাঁপ দিতেও কুণ্ঠিত হবো না আমি! তোমার প্রেমের উষ্ণ পরশ আমার হৃদয়ে যেমন পাহাড়সম হিম্মত ও দৃঢ়তা এনে দেয়, তেমনি তোমার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কষ্ট আমার হৃদয়ে লৌহ শলাকার ন্যায় বিদ্ধ হয়।

তোমার বুকে মাথা রেখে
হাসবো আমি আজীবন।
তোমার দেওয়া কষ্ট আমায়
করে সদা জ্বালাতন।

চোখের পুতুলী আমার! স্বাস্থ্যের প্রতি খুব খেয়াল রেখো। নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করো। আমি থাকতে যেমন ফরজ নামাজ গুরুত্বের সাথে আদায়ের পাশাপাশি ইশরাক, আউয়াবিন, তাহাজ্জুদ ও তিলাওয়াতের প্রতি খেয়াল রাখতে, এখনো কিন্তু তাই করো। তাহের-তামান্নার পড়াশুনা ও স্বাস্থ্যের প্রতি খুব খেয়াল রেখো। তাদেরকে আমার আদর দিও। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর খেদমতের কথা তো তোমাকে বলে দিতে হয় না। তথাপি একটু স্মরণ করিয়ে দিলাম। তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে আসসালামু আলাইকুম পৌঁছিয়ে দিও। কেমন? বাসায় আসার পর তোমার সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আছে। স্মরণ করে দিও।

প্রিয় লক্ষ্মী বউটি আমার! তোমাকে আমি আগেও বলছি এখনও বলছি, জীবনের পিচ্ছিল পথে তোমার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন। তুমি হয়তো জানো না যে, জীবন-যৌবনের পরতে পরতে তোমার দুআ, সহযোগিতা ও প্রাণোচ্ছলতা আমার কত প্রয়োজন। তোমার একটু হিম্মতের কথা, আশার বাণী, স্নিগ্ধ হাসি ও বুক ভরা ভালোবাসা কত দ্রুত যে আমার জীবনকে উন্নতি ও মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে পারে তা হয়তো তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

প্রাণটি আমার! আমি পাবনা থেকে তোমার জন্য একটি সুন্দর উপহার কিনে আনবো। তবে উপহারটি কি হবে তা এখন বলবো না। কেননা এতে আকর্ষণ কমে যেতে পারে। আর বিশেষ কিছু লিখছি না। প্রত্যেক নামাজের পর দুআ করো মহান আল্লাহপাক তার অপরিসীম দয়ায় তোমার আমার মাঝে প্রেমের যে রঙ্গিন ভুবন গড়ে দিয়েছেন; যেখানে তুমি আমি সারাক্ষণ

বিচরণ করি, তা যেন মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম রাখেন। সুখে থাকো, সুখি হও এই কামনা করে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি।

ইতি

তোমার প্রিয়তম

মাসুম।

পরদিন সকালে মাসুম বললো, নাজিয়া, চিঠি পেয়ে ও তা পাঠ করে তোমার কেমন লেগেছিলো তা কিন্তু এখনো তুমি বলো নি।

নাজিয়া বললো, হ্যাঁ, তাইতো! তবে রাতে খাওয়ার পর বলার সময়টা দিলেন কোথায়? আপনি তো আমাকে .....।

নাজিয়া তার কথা শেষ করতে পারলো না। মাসুম বলে উঠলো, তুমি কিন্তু ভারী দুষ্ট হয়ে গেছো। সে যাই হোক, এখন বলো।

নাজিয়া বললো, গত সোমবার বাদ যোহর আপনার পবিত্র চিঠিখানা আমার হস্তগত হয়েছে। তখন আম্মা সাথে থাকায় দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত পড়তে না পেরে চরম অস্থিরতা ভোগ করছিলাম।

ভাবছিলাম, হায়! প্রেমাস্পদের পবিত্র চিঠি হাতে পেয়েও কি পড়তে পারবো না? এ কেমন কথা! এমন সময় হঠাৎ শরীফের আম্মা এসে যাওয়ায় সুযোগ এসে গেলো। এদেরকে আলাপে জুড়ে দিয়ে আমি আস্তে করে আমার রুমে চলে আসি। তারপর চিঠিখানা খুলে কম্পিত হৃদয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে ধীরে ধীরে পড়তে থাকি। পড়তে পড়তে এক সময় কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে যাই। আপনার সুন্দর মুখখানা আমার মানসপটে ভেসে উঠে। মনে হলো, আপনি যেন আমার কোলে বসেই আমাকে সম্বোধন করে কথাগুলো বলছেন। সত্যিই তখন আপনাকে কাছে পেলে প্রাণ ভরে একটু আদর করে চিঠির প্রাকটিক্যাল জবাব দিতাম।

ঃ তাই নাকি?

ঃ অবশ্যই।

ঃ এখন দাও।

ঃ এখন তো আর সেই অবস্থা নেই। তাছাড়া রাত্রে তো.....।

ঃ এখন সেই অবস্থাটা সৃষ্টি করো।

ঃ বললেই তো আর পারা যায় না। তবে চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই।

এটা বাকি রইল। কেমন? আর হ্যাঁ, আপনি বলেছিলেন বাসায় এসে আমার সাথে কি ব্যাপারে নাকি পরামর্শ করবেন?

ঃ ওহ! সে কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম।

ঃ এখন তাহলে শুরু করুন।

ঃ পরামর্শটা হলো, বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা ও সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে। তুমি হয়তো লক্ষ্য করছো যে, মুসলমানদের অবস্থা দিন দিন কেবল অবনতির দিকেই যাচ্ছে। তারা ক্রমেই দ্বীন থেকে দূরে সরে গিয়ে পাশ্চাত্য বেশ-ভূষা ও ধ্যান-ধারণায় আক্রান্ত হচ্ছে, আখেরাতের চিন্তা, মৃত্যু চিন্তা ও কবরের চিন্তা বাদ দিয়ে দ্রুত দুনিয়ার দিকে ধাবিত হচ্ছে। বিধর্মীদের দেখাদেখি তারাও এখন দুনিয়ার জীবনে উন্নতি আর সফলতা অর্জনকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, যাদেরকে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো, তারাই প্রকৃত সফলতা লাভ করলো। আর দুনিয়ার জীবন ধোকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।[৩]

নাজিয়া! এহেন পরিস্থিতিতে একথা ভেবে আমার বড় ভয় হচ্ছে যে, আমরা প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ সামর্থ অনুসারে ইসলামী বিধি-বিধানগুলোকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাতে চেষ্টা না করি, মানুষের ঈমান-আমলের উন্নতির জন্য ফিকির না করি, বিদআতের স্থলে ইসলামের ছহীহ নমুনা ও সুন্নত প্রতিষ্ঠার কোশেশ না করি, যা জানি তা যদি মানুষের কাছে না বলি, তাহলে হাশরের ময়দানে অবশ্যই আমাদের আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। হাদীস শরীফে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যদি আমার পক্ষ থেকে দীনের একটি কথাও জানো তবে উহা অপরের নিকট পৌঁছে দাও।

নাজিয়া! এসব কথা চিন্তা করে, আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, তুমি আমি প্রত্যেকেই আপন আপন শক্তি অনুযায়ী দীনের মেহনত করে যাবো। তুমি প্রতিদিন সকালে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে কুরআন শরীফ ও ইসলামী জিন্দেগীর মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষা দিবে। সেই সাথে রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত সাহাবায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীনের বিভিন্ন ঘটনা শুনিয়ে তাদের মধ্যে দীনি মেজাজ তৈরি করবে। আর সপ্তাহে একদিন এলাকার মা বোনদের নিয়ে কিছু দ্বীনি

৩. সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৮৫

কথাবার্তা, সহীহ আকীদা-বিশ্বাস, মাসআলা-মাসায়েল আলোচনা করবে। সাথে সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার অসারতা ও স্বরূপ উদঘাটন করে তাদেরকে আখেরাতমুখী করার চেষ্টা করবে।

এ তো গেলো তোমার কর্মসূচী। আর আমার কর্মসূচী হলো, মাদরাসায় পড়ানোর বাইরের সময়টুকু তাবলীগের উসূল মোতাবেক লোকদের দাওয়াত দিবো। গাশ্ত ও তালীমে আরও গুরুত্বের সাথে শরিক হবো। প্রতি বছর রমজানে চিল্লার জন্য বের হবো। তাছাড়া কিছুদিন পর পর বড় বড় ওলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীনকে এনে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করে জনগণকে, বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত লোকগুলোর সামনে ইসলামী বিধি-বিধান ও এর সৌন্দর্য তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

নাজিয়া স্বামীর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালো। সে অত্যন্ত খুশি হয়ে বললো, শুনেছি দীনি কাজে দেরী করতে নেই। তাই আসুন অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আমরা আমাদের নিজ নিজ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে শুরু করি।

[সাত]

মাসুমদের এক প্রতিবেশী হাশেম খান। বিরাট বড় লোক। কোটি কোটি টাকার মালিক। বি.বাড়ীয়া শহরে কয়েকটি ব্যবসা আছে। এক সময় থানার দুর্দান্ত দাপটের দারোগা ছিলেন। কয়েক বছর আগে অবসর নিয়েছেন। তার দুই ছেলে এক মেয়ে। ছেলেদের মধ্যে আরমানই বড়। চার বছরের ছোট আকরাম। একবার সে এক ওয়াজ মাহফিলে 'ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও আলেমদের মর্যাদা' সম্পর্কে বয়ান শুনে এস. এস. সি পাশ করে ঢাকা মিরপুরস্থ মাদরাসা দারুর রাশাদে ভর্তি হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলো। কিন্তু পিতার কারণে সে প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় নি। বোন নাজনীন সকলের ছোট। সে বি.বাড়ীয়া সরকারী কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্রী। ওদের ফ্যামিলি খুব আলট্রা মর্ডান। শুধু নামে মুসলমান। ধর্মের আইন কানুন মেনে চলা তো দূরের কথা, ধর্ম কি জিনিস তাই তারা জানে না। রাতের সামান্য সময় ছাড়া বলতে গেলে সারাদিনই টেলিভিশন চালু থাকে। গান-বাদ্য বাজনা তো আছেই। তারা পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতি খুব ভালোবাসে। পর্দাকে অবরোধ মনে করে।

হাশেম খান মাদরাসা শিক্ষা দু'চোখে দেখতে পারেন না। ছোট ছেলে আকরাম যখন মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার কথা বলেছিলো, জবাবে তখন হাশেম খান বলেছিলেন, মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ঐ ফকিরী বিদ্যা পড়ে ভবিষ্যতে পেটে ভাত জুটবে না। সব সময় পরের দয়ার উপর নির্ভর করে থাকতে হবে। ওসব খেয়াল ছেড়ে দাও। আর এখন তোমাকে নামাজ রোজাও করতে হবে না। ঐসব তো বুড়ো বয়সের ব্যাপার। একথা তিনি মাসুমের এক সহপাঠি নাঈমুর রহমান আনসারীকেও বলেছিলেন।

আরেকদিন তিনি কথা প্রসঙ্গে এক বন্ধুকে বলেছিলেন, ধর্ম মেনে চললে আর্থিক উন্নতি করা যায় না। জীবনে অর্থ-সম্পদ ও বিত্ত বৈভবের মালিক হতে হলে, উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে হলে ধর্ম ও মৃত্যুকে ভুলে যেতে হবে।

হাশেম খানের মেয়ে নাজনীন খুবই সুন্দরী। পড়াশুনায় খুব ভাল। ক্লাসের সেরা ছাত্রী। ফারহানা তার একমাত্র বান্ধবী। ফারহানার মামার বাসা থেকে নাজনীনদের বাসা খুব বেশি দূরে নয়। বাসা থেকে বেরিয়ে একটু হাঁটলেই নাজনীনদের বাসা। প্রতিদিন ফারহানা নাজনীনকে নিয়েই কলেজে আসা যাওয়া করে।

[আট]

ফারহানার জীবনে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার প্রায় একমাস পর কলেজ খুললো। গতকাল ফারহানা তার এক ভাইয়ের সাথে মামার বাসায় চলে এসেছে। আগে সে বেশির ভাগ সময় একাই চলে আসতো। কিন্তু ঐ রাতের ঘটনার পর তার ভিতর ভয় ঢুকে গেছে। এখন সে একা একা কোথাও যেতে ভয় পায়। না জানি পাষণ্ডরা তাকে আবার আক্রমণ করে বসে।

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর আজ কলেজের প্রথম দিন। ফারহানাদের ক্লাস ১০টা থেকে শুরু হবে। নাজনীন কলেজে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফারহানা সাধারণত সাড়ে নয়টার দিকে নাজনীনদের বাসায় আসে। কিন্তু আজ প্রথম দিন হিসেবে নয়টার দিকেই চলে এসেছে। নাজনীন তার বান্ধবী ফারহানাকে ছাড়া সাধারণত কলেজে যায় না। আজ প্রথমদিন হিসেবে ফারহানা আসে কিনা এ নিয়ে সে চিন্তা করছিলো। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগেই ফারহানা এসে পড়ায় নাজনীন চিন্তামুক্ত হলো। বললো-

ঃ কেমন আছিস ফারহানা? আমি তো তোর চিন্তায় মরিয়া হয়ে উঠছিলাম, মরেই যাচ্ছিলাম।

ঃ খুব ভালো নয়। তুই কেমন আছিস?

ঃ আমি খুব ভাল আছি। তোর ভাল না থাকার কারণটা তাড়াতাড়ি বল্। কোনো অসুখ বিসুখ হয়নি তো?

ঃ অসুখ না হলেও অনেকটা অসুখের মতোই।

ঃ সে আবার কেমন?

ঃ মানে অসুখটা শরীরে নয়, মনে।

ঃ তবে কি কোন যুবকের প্রেমে মজেছিস?

ঃ নাজনীন! তুই তো জানিস যে, আমি এসব মোটেও পছন্দ করি না। তারপরও তুই এ কথাটা বলতে পারলি?

ঃ ওমা, এটুকু বলাতে আমার দোষ হয়ে গেল? তুই তো কথাটা আমার মুখে তুলে দিয়েছিস। মনে কষ্ট পেলে মাফ করে দিস্। এখন বল্ ঘটনা কি?

ঃ হ্যাঁ, বলছি। তবে তার আগে একটা প্রশ্নের জবাব দে তো?

ঃ কি প্রশ্ন?

ঃ তুই কি মাসুম নামে কোন ছেলেকে চিনিস?

ঃ কেন? তার সাথে আবার কি হলো?

ঃ সে যা-ই হোক, চিনিস্ কিনা বল্।

ঃ ভাল করেই চিনি। তিনি তো আমাদের মহল্লারই লোক। হুজুর মানুষ। কোথায় যেন শিক্ষকতা করেন। কয়েক বছর আগে বিয়ে করেছেন। দুটি ছেলে মেয়ে আছে।

ঃ বিয়ে করেছেন, ছেলে মেয়ে আছে, এসব তো তোকে আমি জিজ্ঞেস করি নি।

ঃ না মানে, আবার যদি তার সাথে.....। এজন্যে আগে ভাগেই কথাটা বলে দিলাম।

ঃ তুই শুধু সব ব্যাপারেই খামখেয়ালী করিস্। এ বদঅভ্যাস কবে যে তোর দূর হবে!

ঃ এটা আমার বদঅভ্যাস হোক আর খামখেয়ালীই হোক এসব কথা কিন্তু

কারো কারো ভালো লাগে।

ঃ না, ভাই তোর সাথে আমি কথায় পারবো না। সময় হয়ে গেছে। চল্ এবার রওয়ানা দেই।

ঃ কী? ঘটনা শুনাবি না? মনটা কেন খারাপ, মাসুম ভাইয়ের সাথে কি হলো- এসব কিছুই বলবি না?

ঃ এখন আর হচ্ছে না। আজ বিকালে মামার বাসায় যাবি। সেখানেই সব বলবো।

ঃ ঠিক আছে, তাই হবে।

[আট]

সেদিন বিকালে নাজনীন, ফারহানার মামার বাসায় গেলো। বাসায় তখন ফারহানা ও তার মামানী ছাড়া আর কেউ ছিলো না। নাজনীন পূর্বে আরও কয়েকবার এ বাসায় এসেছে। সে কারণে ফারহানার মামানী ভাল করেই নাজনীনকে চিনে। উপরন্তু ফারহানার বান্ধবী হওয়ায় তিনি তাকে অত্যন্ত আদরও করেন।

ফারহানার মামানীর নাম আতিকা বেগম। তিনি একজন দীনদার মহিলা। বালেগা হওয়ার পর থেকেই পর্দা করেন। ইসলামের বিধি বিধান মেনে চলেন। সুন্নত মুতাবেক জীবন পরিচালনা করেন। স্বামী আফজাল সাহেব কয়েকবার টিভি কিনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু তিনি বিভিন্ন উপায়ে স্বামীকে বুঝিয়ে তা থেকে বিরত রেখেছেন।

আতিকা বেগম ফারহানা ও নাজনীনদের মতো তরুণীদের নিয়ে খুব ভাবেন। কিভাবে তাদেরকে দীনের পথে ফিরিয়ে আনা যায়, এ নিয়ে খুব ফিকির করেন। এসব মেয়েরা খোলামেলা চলাফেরা করলে সমাজের অবস্থা কি দাঁড়াবে, কত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে এ নিয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। স্বামীর সাথেও এ ব্যাপারে তিনি অনেক আলোচনা করেছেন। কিন্তু আফজাল সাহেব বরাবরই বলেছেন, আতিকা! এসব যুগের চাহিদা, এখন আর আগের দিন নেই। চৌদ্দশ বছর আগের ইসলাম আর এখন চলবে না। স্বামীর এসব কথায় আতিকা বেগম মনের কষ্ট মনেই চেপে রাখতেন।

দুই বান্ধবীর আলাপ আজ বেশ জমে উঠেছে। ফারহানা বলে- নাজনীন! আমার জীবনের কোনো কিছুই তোর অজানা নেই। যখন যা ঘটে সবই তোর কাছে বলি। কিন্তু একটি বিষয় কোনোদিন আমি তোর নিকট বলি নি। কিন্তু আজ না বলে পারছি না। আর এজন্যেই তোকে এখানে নিয়ে এসেছি।

ঃ বল্ বোন বল্। আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।

ফারহানা বলতে শুরু করলো-

গত বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়িতে যাই। দুদিন পর আমার বড় ভাই কামালের সাথে ওর এক বন্ধু আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে। ছেলেটির নাম কায়সার। শিক্ষিত ছেলে। এম. এ পাশ। এক বেসরকারি ফার্মে চাকরি করে। বলিষ্ঠ সুশ্রী পুরুষ। কিছু কিছু ছেলে এমন আছে যাদেরকে একবার দেখলে বারবার দেখতে ইচ্ছে করে। কায়সার ছিল তাদের দলে।

ভাইয়ের বন্ধু হিসেবে আমি তার সাথে পরিচিত হই। কথাবার্তা বলি। উত্তমরূপে আদর আপ্যায়ন করি। সে আমাদের বাড়িতে চারদিন ছিল। প্রথম দিনেই সে আমার সাথে ভাব জমিয়ে ফেলে। পরের তিন দিন যখনই ভাই কোথাও চলে যেত তখনই সে আমাকে কাছে ডাকতো। আমি আনন্দ চিত্তেই তার কাছে যেতাম। পড়াশুনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতাম। এতে বাসার কেউই কিছু মনে করতো না।

নাজনীন! কায়সার শিক্ষিত ছেলে হলেও তার মনটি যেমন ছিলো কুৎসিত লালসাপূর্ণ, তেমনি সচতুর ছিলো সে। তার ভিতরের রূপটা কেউ সহজে ধরতে পারতো না। যেমনটি আমি পারি নি। আর পারি নি বলেই আমার এতবড় সর্বনাশ হতে যাচ্ছিলো। বিড়াল তপস্বীর মতো নিজকে সাধু সাজিয়ে কার্য সিদ্ধির উপায় খুঁজতো সে।

এরপর থেকে কায়সার প্রায়ই আমাদের বাসায় আসতো। আমি বাড়িতে আছি কিনা ফোনে আগেই খবর নিতো। এভাবে কয়েক মাস চলার পর এক পর্যায়ে একে অপরকে প্রচণ্ডভাবে ভালোবেসে ফেলি।

এতটুকু বলার পর ফারহানার মুখ থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে। তারপর আবার বলে-

নাজনীন! হুজুরদের মুখে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় বই পুস্তক পড়েছি, তরুণ তরুণীদের বিবাহ পূর্ব প্রেম-ভালবাসা, দেখা-সাক্ষাত, আলাপ-আলোচনা, মন

দেওয়া-নেওয়া, চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান সবই হারাম এবং না জায়েজ। এই সহজ সুন্দর কথাটি তখন বুঝে না আসলেও আজ আমার হাড়ে হাড়ে বুঝে আসছে। শুধু বুঝেই আসে নি, পৃথিবীর সকল তরুণ-তরুণী এবং যুবক-যুবতীকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে-

হে যৌবনের জোয়ারে ভাসমান তরুণ-তরুণীরা! তোমরা ইসলামের শাশ্বত বিধান 'পর্দা' রক্ষা করে চলো। বিবাহপূর্ব প্রেম-ভালবাসার কবর রচনা করে ইসলামী বিধি মোতাবেক জীবন যাপন করো। এতেই তোমাদের সম্মান, এতেই তোমাদের ইজ্জত, এতেই রয়েছে তোমাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি।

নাজনীন! আমি তোর কাছে আমাদের এ ভালোবাসা ও গোপন অভিসারের কথা বলতে গিয়েও বলি নি। তুই আবার কি মনে করবি এজন্য বলা হয় নি। গত বন্ধের সময় আমি যখন বাড়িতে যাই তখনই আমার জীবনে ঘটে যায় আরেকটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। কিন্তু আল্লাহর অসীম রহমত যে, মাসুম ভাইয়ের ওসিলায় আমি সেদিন চূড়ান্ত সর্বনাশ থেকে বেঁচে যাই।

ঃ এ জন্যেই বুঝি মাসুম ভাইয়ের খোঁজ খবর নিচ্ছিস। কথার মাঝখান দিয়ে নাজনীন বলে উঠে।

ঃ হ্যাঁ, তাই। আগামী কালই আমি মামানীসহ তোকে নিয়ে মাসুম ভাইদের বাসায় যাবো। তার স্ত্রীর সাথে পরিচিত হবো। সেখানে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিবো আমাদের সামনের করণীয় কি?

ঃ ঠিক আছে যাবো তোদের সাথে। এখন বাকি ঘটনা বল্।

ফারহানা বলে-

কায়সারের সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাওয়ার পর একদিন দুপুর বারটার দিকে সে আমাদের বাসায় আসে। বাসায় সেদিন কাজের ছেলেটি ছাড়া আর কেউ ছিল না। আব্বা আম্মা ও ছোট ভাই হাবীব আমার খালার বাসায় বেড়াতে গেছেন। দু'তিন দিন থাকবেন। কায়সার এ খবর কিভাবে যেন পেয়ে যায়। আমাদের দেখাশুনার জন্য বড় ভাই তখন বাড়িতে ছিলেন। কিন্তু সুচতুর কায়সার মিথ্যা কথা বলে চাকরির ভুয়া খবর দিয়ে ভাইকে আজ সকালে ঢাকা যেতে বলে।

বড় ভাই খবর পেয়ে আমাকে ডেকে বললেন- ফারহানা! চাকরির ব্যাপারে কায়সার ফোন করেছে। আমাকে আজ সকাল ১০টায় ঢাকায় যেতে বলেছে। আমি যাচ্ছি। সন্ধ্যা নাগাদ ফিরবো। এ বলে তিনি চলে গেলেন।

কায়সার আমাকে বাসার একটি নির্জন কক্ষে ডাকে। কাজের ছেলেটিকে দূরে সরানোর জন্য মিষ্টি আনার বাহানা দিয়ে তাকে বাজারে পাঠিয়ে দেয়। তখন আমার মনে ভয় ঢুকলেও সৌজন্যের খাতিরে যাই। প্রথমে সে আমার সাথে অন্যান্য দিনের মতোই ভালো ব্যবহার করে। পড়াশুনার খোঁজ খবর নেয়। কুশলাদি জিজ্ঞেস করে। তারপর এক পর্যায়ে নাপাক প্রস্তাব পেশ করে।

এতক্ষণে আমার হুঁশ ফিরে আসে। আমি বুঝতে পারি, অসময়ে তার আগমনের কারণ। কায়সারের দ্বারা এমনটি হতে পারে ইতোপূর্বে কখনোই ভাবতে পারি নি আমি। কিন্তু যা ভাবি নি, ভাবতে পারি নি, তাই আজ বাস্তব হয়ে দেখা দিল।

কায়সার আমার পক্ষ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে বললো- ফারহানা! ভয় পাচ্ছ বুঝি! ক'দিন পর তো আমাদের বিয়েই হবে। সুতরাং তার আগে.....।

আমি তাকে কথা শেষ করতে দিলাম না। রাগে ফুলে উঠেছে আমার দেহের প্রতিটি মাংসপেশী। মুখমন্ডল হয়ে উঠেছে রক্তের মতো লাল। হঠাৎ আমার অজান্তেই একটা শক্ত চপেটাঘাত তার গালে আঘাত হানে। সেই সঙ্গে আমার মুখ থেকে বের হয়।

কায়সার! তুমি যে এতটা কুৎসিত মনের মানুষ তা আগে জানতাম না। তোমাকে আমি যে পরিমাণ ভালোবাসতাম আজ থেকে সেই পরিমাণ ঘৃণা করি। মনে রেখো, চরিত্রহীন কুৎসিতমনা কোনো পুরুষকে কোনো সৎচরিত্রা নারী প্রেম-প্রীতি আর ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না।

চপেটাঘাত খাওয়ার সাথে সাথে কায়সার যেন দানবে পরিণত হয়। লজ্জা, ক্ষোভে লাল হয়ে উঠে তার চোখ মুখ। সঙ্গে সঙ্গে সে আমার দিকে এগিয়ে আসে। আমি নিজকে বাঁচানোর জন্য দ্রুত রুম থেকে বের হয়ে পড়ি। সেও আমার পিছনে পিছনে আসতে থাকে। বলতে থাকে- ফারহানা! এই অপমানের চরম শাস্তি তোমাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

এমন সময় কাজের ছেলেটি মিষ্টি নিয়ে ফিরে আসায় কায়সার থমকে দাঁড়ায়। আমিও তখনকার মতো পাষন্ডের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই। রক্ষিত হয় আমার ইজ্জত-সম্ভ্রম। এরপর কায়সার দেরি না করে বাড়ি থেকে বের হয়ে চলে যায়।

লজ্জার কারণে এ ঘটনা আমি কাউকে বলি নি। এমনকি বড় ভাইকেও নয়। এর কয়েক দিন পর রাতের বেলা প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে ঘরে ফিরার সময় মুখোশ পরা কয়েকজন যুবক আমার মুখ চেপে ধরে এবং আমাকে পাঁজাকোলে করে রাস্তার অদূরে এক ভগ্ন দেয়ালের কাছে সম্ভ্রম হানির চেষ্টা চালায়। এসময় মাসুম ভাই আমাকে উদ্ধার করে বাসায় পৌঁছে দেয়। সত্যি নাজনীন! মাসুম ভাই যে কত ভদ্র ও অমায়িক, কত বিনয়ী ও নম্র, কত সাহসী ও চরিত্রবান তা আমি সেদিনই বুঝতে পেরেছি।

ঃ মাসুম ভাইয়ের বউ তো ওর চেয়েও বেশি অমায়িক ও মিশুক। তবে এরা হুজুর টাইপের লোক কিনা এজন্য তাদের বাসায় আমার আসা যাওয়া তেমন নেই। নাজনীন বললো।

ঃ হ্যাঁ, ভাই! দীনদার লোকদের থেকে দূরে থাকা, তাদের সংশ্রবে না যাওয়া আমারও অভ্যাস ছিলো। সেজন্য আতিকা মামানীকেও আমি পছন্দ করতাম না। কেননা তার কাছে গেলেই পর্দার কথা, নামাজের কথা, ইত্যাদি বলতো। কিন্তু আজ আমার ভুল ভেঙ্গেছে। নিয়ত করেছি, বাকি জীবন এসব নেক লোকদের কাছেই ভীড়ে থাকবো। কেননা, মূলত তারাই আমাদেরকে কল্যাণের পথ দেখান।

সেদিন কথাবার্তার শেষ পর্যায়ে আতিকা বেগমও শরিক হয়েছিলেন। ফারহানার মনোভাব পরিবর্তন হতে দেখে তিনি দারুন খুশি হলেন। সেই সাথে মাসুমের স্ত্রী নাজিয়ার সাথেও পরিচিত হওয়ার আগ্রহ পেশ করলেন। অবশেষে পরামর্শ মোতাবেক সিদ্ধান্ত হলো আগামী শুক্রবার সকাল ১০ টায় এরা তিনজন মাসুমদের বাসায় যাবে। তবে এর আগে নাজনীন ফোন করে নিশ্চিত হবে যে, মাসুম তখন বাসায় থাকবে কিনা।

[নয়]

মাসুম তার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ শুরু করে দিয়েছে। সে এখন জোরদার ভাবে তাবলীগের বিভিন্ন কাজে শরিক হয়। নিয়মিত ঘরে ও মসজিদে শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র.) লিখিত ফাযায়েলে আমল কিতাবখানা দিয়ে তালীম করে। প্রতি সপ্তাহে দুটি গাশত করে। মাসে তিন

দিন লাগায়। অবশ্য ঐ তিন দিন মাদরাসা খোলা থাকলে ক্লাসের সময় ক্লাস করে আবার মসজিদে চলে যায়।

কিছু দিন পূর্বে শহরের জামে মসজিদে সে ইমামতির দায়িত্ব পায়। সেখানে পূর্ব থেকেই গাশ্‌ত-তালীম চালু ছিল। সে ইমাম হওয়ার পর গাশত তালীম ছাড়াও লোকদের মধ্যে বিশুদ্ধ আকীদা বিশ্বাস, পবিত্র কুরআনের সহীহ তিলাওয়াত ও সুন্নতের প্রতি মহব্বত সৃষ্টির জন্য প্রত্যহ বাদ ফজর সকল মুসুল্লীদের নিয়ে তালীমে বসে। ঐ সময় সে কিছুক্ষণ তিলাওয়াতের মশক করার পর দু'একটি মাসআলা ও দু'একটি সুন্নত সম্পর্কে জোড়ালো আলোচনা রাখে। অতঃপর কেউ কোনো প্রশ্ন করলে তারও যথোপযুক্ত জবাব দেয়। সবশেষে এলাকার একটি লোকও যাতে বেনামাজি না থাকে সেজন্য দশ পনের জন মুসল্লী নিয়ে মহল্লায় দাওয়াতের জন্য বেরিয়ে পড়ে। এতে অল্পদিনের মধ্যে কল্পনাতীত হারে নামাজির সংখ্যা বাড়তে থাকে।

কয়েক মাস যাওয়ার পর ইমাম সাহেব এলাকার অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম ও মুসল্লীদের নিয়ে পরামর্শ করে তিন দিন ব্যাপী একটি মহাসম্মেলনের আয়োজন করে। উক্ত মহা সম্মেলনে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়। স্থান হিসেবে বি.বাড়ীয়া সরকারি কলেজের বিশাল মাঠকে নির্বাচন করা হয়। তারিখ ২৪,২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর রোজ শনি, রবি ও সোমবার। এরপর সম্মেলনের বিভিন্ন দায়িত্ব উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম ও এলাকার কর্মঠ যুবকদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয়।

এদিকে নাজিয়াও বাসায় একটি প্রশস্ত রুমে সকাল বেলা মক্তব এবং বিকাল বেলা মেয়েদেরকে কুরআন শরীফ ও জরুরি মাসআলা মাসায়েল শিক্ষা দিতে লাগলো। তাছাড়া প্রতি শুক্রবার বিকাল তিনটা থেকে পাঁচটার মধ্যে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু করল। মোটকথা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ঘরে বাইরে সর্বত্র ইসলাম প্রচার প্রসারের কাজ জোড়ালো ভাবে চালু করলো।

[দশ]

নাদিরা হাশেম খানের একমাত্র পুত্রবধূ নাজনীনের ভাবী। নাজনীনের আম্মা মারা যাওয়ার পর হাশেম খান বড় ছেলে ফরমানকে নিয়ে বড় আশা করে পুত্রবধূকে ঘরে তোলেন ভেবে ছিলেন, ছেলের বউ সেবা যত্ন করবে

www.smfoundationbd.com

কিন্তু তার সে আশা পূরণ হয় নি। যতটুকু করে তার চেয়ে খ্যাচ-ম্যাচ করে বেশি। পান থেকে চুন খসতেই রেগে আগুন হয়ে যায়। হাশিম খান এখন বৃদ্ধ। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। এই বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ শরীর নিয়ে বড় লোকের শিক্ষিত মেয়ে নাদিরাকে তেমন কি আর বলবেন! সুতরাং সবকিছু নীরবে সহ্য করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না তার।

একদিন রাতের বেলা। হাশিম খান ঔষধ খাবেন। এক গ্লাস পানির প্রয়োজন। উঠে আনার মতো শক্তি নেই। তাই নাদিরাকে ডেকে এক গ্লাস পানি চাইলেন।

নাদিরা শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ে। গত বছর ইংলিশে অনার্স করার দু'মাস পর আরমানের সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করতে হয়, তাদের মন খুশি রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হয়, তাদেরকে শ্রদ্ধা করতে হয় এ শিক্ষা নাদিরা কোথাও পায় নি। বরং সে পেয়েছে আধুনিকতার শিক্ষা। পর্দাহীনতার শিক্ষা। পেয়েছে সম অধিকার ও স্বামীকে কেবল বন্ধু ভাবার শিক্ষা। অতএব, শ্বশুর-শাশুড়ী ও স্বামীর খেদমতে তার বিরক্তবোধ হবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

একবার দু'বার ডাকার পরও যখন নাদিরার সাড়া পাওয়া গেল না তখন হাশেম খান একটু উচ্চ আওয়াজেই বললেন-

ঃ অ বউমা! এক গ্লাস পানি চেয়েছিলাম।

নাদিরা পূর্বের ডাক দুটিও শুনেছে। কিন্তু কাজে ব্যস্ত থাকায় শুনেও না শুনার ভান ধরেছে। এবার উঁচু আওয়াজে ডাক পড়ায় বিরক্তির স্বরে বললো-

ঃ হ, হ শুনেছি। বুড়ো মানুষ যে এত বকবক করতে পারে তা আগে জানতাম না।

এ বলে নাদিরা এক গ্লাস পানি টেবিলে রেখে চলে যেতে চাইলো। যাওয়ার আগে শ্বশুরের মুখের দিকে তাকাতেই বুঝে নেয় ঔষধের কথা বলে দিতে হবে।

ঃ রাতে কোন্ ঔষধ খেতে হয় তা কি মনে নেই? নাদিরা ঝাঝাঁলো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে।

ঃ না, মা ভুলে গেছি। বললেন, হাশেম খান।

ঃ আর কতবার বুঝিয়ে দেব? এবারই শেষ, ভাল করে বুঝে রাখুন। এ ক্যাপসুল দুটো, এ ট্যাবলেট একটা আর এ সিরাপ দু'চামচ।

এক নিঃশ্বাসে ঔষধ খাওয়ার নিয়ম বলে দিল নাদিরা।

ঃ ঠিক আছে মা, ঠিক আছে। আর বুঝিয়ে দিতে হবে না। তুমি যাও আমি খেয়ে নিচ্ছি। এ বলে হাশেম খান ঔষধগুলো কাছে টেনে নিলেন। নাদিরা চলে গেলো।

ঔষধ খেয়ে হাশেম খান শুয়ে পড়েন। ঘুম অনেক কমে গেছে। শুয়ে শুয়ে জ্যোছনা ভরা আকাশের দিকে তাকান। এসময় মনে পড়ে অতীতে বিলীন হয়ে যাওয়া কত স্মৃতি.....।

আহা! কী দাপটে অতিবাহিত হয়ে গেছে হাশেম সাহেবের জীবন। এক সময় থানার দুর্দান্ত দাপটের দারোগা ছিলেন। থানা ও থানার আশে পাশের সকলেই জানতো, হাশেম দারোগা কত দুঃসাহসী, কত ভয়ঙ্কর। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটতেন অধীনস্থ লোকেরা লম্বা স্যালুট দিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে যেতো। এলাকার লোকজন লম্বা সালাম হাঁকতো। অপরাধীরা চলে যেত অন্য রাস্তায়। কিন্তু আজ? আজ যেন তার সব হারিয়ে গেছে। কবর রচিত হয়েছে শক্তি সামর্থ আর প্রচণ্ড দাপটের। হাশেম খান ভাবতে থাকেন, চাকুরী থেকে অবসর নিলে মান-মর্যাদা প্রভাব কি এভাবেই হারিয়ে যায়? এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

[এগার]

একদিন বিকেল বেলা। টেবিলে রাখা ফোনটা স্বভাবসূলভ কণ্ঠে বলে চললো- ক্রিং..... ক্রিং..... ক্রিং..... ডাকে সাড়া দিন, ডাকে সাড়া দিন। নাজিয়া মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.) কর্তৃক সংকলিত 'মাজালিশে হাকীমুল উম্মত' নামক কিতাবখানা পড়ছিলো। এমন সময় ফোন আসায় সে রিসিভার উঠায়। বাসায় তখন মাসুম ছিলো না। নাজিয়া রিসিভার উঠাতেই অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে এলো-

ঃ হ্যালো..... আপনি কে বলছেন?

ঃ আমি তাহেরের আম্মা। দয়া করে আপনার পরিচয়টা বলবেন কি?

ঃ আমাকে চিনতে পারেন নি? দেখুন না চেষ্টা করে চেনা যায় কি-না।

নাজিয়া নাজনীনের কণ্ঠ চিনতে না পেরে কিছুটা বিব্রতবোধ করলো।

আর চিনবেই বা কেমন করে? এই দীর্ঘ চার পাঁচ বছরের মধ্যে নাজনীন তো নাজিয়াদের বাসায় দু'তিন বারের বেশি যায় নি। আর না যাওয়ার মূল কারণ হলো, মাসুম-নাজিয়ারা হুজুর- সেকেলে মানুষ। সেখানে গেলেই ধর্মের কথা শুনতে হবে।

নাজিয়া নাজনীনকে চিনতে না পেরে বললো-

ঃ না, আপনাকে চিনতে পারছি না। মেহেরবানী করে নামটা বললে হয়তো চিনতে পারতাম।

ঃ আমি নাজনীন। হাশেম খানের মেয়ে। এবার চিনলেন তো?

ঃ হ্যাঁ, চিনেছি। তো বোন কেমন আছেন? হঠাৎ কি মনে করে ফোন করলেন?

ঃ ভাল আছি। মাসুম ভাই আগামী কাল দশটায় বাসায় থাকবেন কি-না?

ঃ তিনি শুক্রবার প্রায় সারাদিন বাসায় থাকেন। বাসার বিভিন্ন কাজ সমাধা করেন। সপ্তাহের মাঝখানে তো খুব একটা সময় পান না তাই.....।

ঃ ঠিক আছে। আগামীকাল দশটায় আমি আমার বান্ধবী ফারহানা ও তার মামানীকে নিয়ে আপনাদের বাসায় আসছি। কেন আসছি, তা তখনই জানতে পারবেন।

ঃ ঠিক আছে আসুন। আসলে অত্যন্ত খুশি হবো।

ঃ ধন্যবাদ বলে নাজনীন রিসিভার রেখে দিলো।

[বার]

পরদিন ঠিক দশটায় ফারহানা, নাজনীন ও আতিকা বেগম নাজিয়াদের বাসায় পৌঁছলো। নাজিয়া রাতেই এ সংবাদ স্বামীকে জানিয়ে দিয়েছিলো। ফারহানার নাম শুনে ঐ রাতের ঘটনার কথা মাসুমের মনে পড়লো। সে সকালে বাজারে গিয়ে নাস্তা ও দুপুরের খাবারের জন্য যাবতীয় সওদা কিনে আনল। মেহমানরা বাসায় পৌঁছলে নাজিয়া সুন্নত পালনের নিয়তে অত্যন্ত সম্মান ও সন্তুষ্টির সাথে তাদেরকে গ্রহণ করলো। নাজনীন বান্ধবী ফারহানা ও মামানী আতিকা বেগমকে নাজিয়ার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো। তারপর এখানে আসার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করলো।

নাজিয়া বললো, ফারহানার ঘটনা আমি হুজুরের মুখে শুনেছি। কিন্তু ঘটনার মূল কারণ হুজুরের জানা না থাকায় তা তিনি বলতে পারেন নি। হুজুর বলেছেন- ফারহানা নিজেই নাকি আমাদের বাসায় এসে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ করবে।

ফারহানা বললো, ভাবী, মাসুম ভাই কি বাসায় নেই?

ঃ হ্যাঁ আছেন। তিনি একটি বিশেষ প্রয়োজনে পাশের বাসায় গেছেন। এক্ষুণি এসে পড়বেন। এবার আপনি বলুন কেন, কি জন্য আপনার এই সর্বনাশ হতে যাচ্ছিলো।

প্রাথমিক ভাবে আপ্যায়নের জন্য নাজিয়া আগেই সবকিছু প্রস্তুত করে রেখেছিলো। এখন কাজের ছেলে সোহাইল এসব নিয়ে হাজির হলে নাজিয়া নিজ হাতে পরিবেশন করে সবাইকে খাওয়ালো।

নাস্তা পর্ব শেষ হওয়ার পর নাজনীন ফারহানার মুখ থেকে যা কিছু শুনেছিলো সব বিস্তারিত বর্ণনা করলো। এ ব্যাপারে তাকে আতিকা বেগম সাহায্য করলো। সব শুনে নাজিয়া বললো-

ইসলাম একটি সুন্দর ও শাশ্বত ধর্ম। এর প্রতিটি বিধানই মানুষের জন্য কল্যাণকর। এই কল্যাণ শুধু আখেরাতেই নয়, দুনিয়াতেও। যারা ইসলামের নিয়ম-নীতি অনুসারে জীবন যাপন করবে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই তাদের সফলতা সুনিশ্চিত। আর যারা ইসলাম মানবে না, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকা অনুযায়ী জীবন যাপন করবে না তারা দুনিয়াতে যেমন বিভিন্ন বিপদাপদ ও পেরেশানীর সম্মুখীন হবে তেমনি আখেরাতেও তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

এই ধরুন পর্দার কথাই বলি। মেয়েরা যদি ইসলামি শরিয়তের নির্দেশ মোতাবেক পর্দা করে চলাফেরা করতো তবে কি এতসব দুর্ঘটনা ঘটতো? তারা কি পথে ঘাটে এমনি ভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত হতো?

জবাবে ফারহানা ও নাজনীন নিশ্চুপ থাকলেও আতিকা বেগম বলে উঠলেন, নিশ্চয় না। এর শত শত উদাহরণ আজ আমাদের চোখের সামনে। বেশি দূরে যাওয়ার প্রয়োজন কি? ফারহানা যদি পর্দা করতো, তাহলে নিশ্চয়ই সে ভাইয়ের বন্ধু কায়সারের সামনে যেতো না। আর বন্ধু যদি তাকে না-ই দেখতো তবে ফারহানাকেও এতবড় বিপদের সম্মুখীন হতে হতো না।

আতিকা বেগম কথা শেষ করলে ফারহানা বললো, মামানী, আমার মনে হয় ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাব ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবেই আজকালের তরুণ-তরুণীরা বিপদগামী হচ্ছে। তাই নাজিয়া ভাবীর নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ, তিনি যেন সপ্তাহে কমপক্ষে একটি দিন আমাদের জন্য বরাদ্দ করেন এবং ঐ দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

নাজিয়ার সুন্দর ভদ্র ও মার্জিত ব্যবহারে শুধু ফারহানা আর আতিকা বেগমই নয়, নাজনীনও দুর্বল হয়ে পড়েছে তার প্রতি। তার জ্ঞানগর্ভ কথায় সবাই মুগ্ধ হয়েছে। তাই ফারহানা থামতেই নাজনীন ও আতিকা বেগম একত্রে বলে উঠলো- হ্যাঁ, আমরাও ফারহানার সাথে একমত। নাজিয়া ভাবীর কাছে এটা আমাদের প্রাণের দাবি।

এসময় মাসুম বাসায় এলে পর্দার আড়াল থেকে মেহমানদের সাথে তার কুশল বিনিময় হয়। এক পর্যায়ে সে তাদেরকে কিছু জরুরি কথা বলে এবং সবশেষে দুপুরের খানা খেয়ে যাওয়ার জন্য রাযি করায়।

ফারহানাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে নাজিয়া মাসুমের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করে। অতঃপর তাদেরকে ফিরে এসে বলে, আপনারা যা চাচ্ছেন এ ধরনের ব্যবস্থা আজ কয়েক সপ্তাহ যাবত আমাদের বাসায় চালু হয়েছে। আমাদের ড্রইং রুমসহ বাইরের এ খালি অংশটুকু এ কাজের জন্যই আমরা নির্ধারণ করেছি। এলাকার বেশ কিছু মহিলা প্রতি শুক্রবার বিকাল তিনটায় চলে আসেন এবং পাঁচটায় আসরের নামাজ পড়ে বিদায় নেন। যদি আশ-পাশের অন্যান্য মহিলাসহ আপনারাও নিয়মিত এ প্রোগ্রামে শরিক হন আশা করি আমাদের সকলেরই অনেক ফায়দা হবে।

ফারহানারা যা চাচ্ছিলো তা আগে থেকেই চালু থাকায় তারা যারপর নাই খুশি হলো। বললো, শুধু অংশ গ্রহণই নয়, আল্লাহ চাহেতো আমরা এই দীনি ইজতেমার কামিয়াবীর জন্য সব ধরনের সহযোগিতাও প্রদান করবো।

এ সময় মাসুমের গোসলের সময় হয়ে গেলে নাজিয়া বললো- আপনারা গল্প করুন। আমি একটু আসছি। এ বলে সে চলে গেলো এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্বামীর জন্য গোসলের যাবতীয় এন্তেজাম করে ফিরে এলো।

নাজিয়া যেহেতু ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের অন্যতম লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে, তাই স্বামীর যে কোনো খেদমতের

ব্যাপারে কখনোই সে পিছিয়ে থাকে না। এমনকি মাসুম তার জন্য এত কষ্ট করতে নিষেধ করলে সে বলে, আপনার সেবা করে যদি শান্তি পাই, হৃদয়-মন সীমাহীন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়, বেহেশতের রাস্তা সুগম হয় তবে কি দাসীকে এতটুকু সুযোগও দিবেন না?

নাজিয়া গোসলের সময় হওয়ার আগেই লুঙ্গি-গামছা, মিছওয়াক ইত্যাদি বাথরুমে রেখে দেয়। সপ্তাহে কমপক্ষে দুদিন স্বামীর সমস্ত শরীর সাবান দিয়ে ডলে দেয়। গোসল শেষ হলে নিজের হাতে গামছা দিয়ে শরীরটা মুছে দেয়। তারপর ভিজা লুঙ্গি ও গামছা ধুয়ে রৌদ্রে নেড়ে দেয়। অবশ্য এসব কাজে মাসুমও পিছিয়ে নেই। সেও গোছল সহ পারিবারিক বিভিন্ন কাজে নাজিয়াকে যথেষ্ট সহযোগিতা করে।

আতিকা বেগম অত্যন্ত হুঁশিয়ার মহিলা। তিনি ফারহানাদের সাথে গল্প করলেও জানালার ফাঁক দিয়ে নাজিয়ার গতিবিধি লক্ষ্য রেখেছেন। তিনি যখন দেখলেন, নাজিয়া এতটাই পতিপরায়ণা তখন তার প্রতি তার মহব্বত আরও বেড়ে গেলো। মনে মনে বললেন, স্ত্রী হলে এমনই হওয়া চাই। এ ধরনের মেয়েদের দ্বারাই সমজের আমূল পরিবর্তন হওয়া সম্ভব।

নাজিয়া ফিরে এলে আবার আলোচনা শুরু হলো। আতিকা বেগম বললেন- আমাদের পক্ষে আজকের প্রোগ্রামে বোধ হয় শরিক হওয়া সম্ভব হবে না। খাওয়া-দাওয়া শেষে বাসায় যেতে যেতে দুটা আড়াইটা বেজে যাবে। সুতরাং আপনার সময় থাকলে এখনই আরও দু চারটি কথা শুনিয়ে দিন।

নাজিয়া বললো, আপনারা মেহমান। মনে তো চায় পুরো সময়টুকু আপনাদের সাথে থাকি। কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে তা সম্ভব হবে না। রান্না-বান্নার সময় প্রায় হয়ে এলো, একটু পরেই আমাকে যেতে হবে। এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। তবে যাওয়ার আগে দু একটি কথা বলতে চাই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ অবশ্যই বলুন। সকলেই সমস্বরে বলে উঠলো।

নাজিয়া বললো-

ঃ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত যতগুলো অবস্থার সৃষ্টি হয়, এক কথায় মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি স্তরে যত ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয় বা হতে পারে, তার সুষ্ঠু, সুন্দর ও উত্তম সমাধান ইসলামে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে রয়েছে। অনেকে মনে করেন, ইসলাম কেবল

নামাজ, রোজা, হজ্ব যাকাত কুরবানি এবং এ জাতীয় কিছু আচার-অনুষ্ঠানের নাম। আসলে তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

নাজনীন এসব কথা কোনো দিন শোনে নি। তাই নাজিয়ার কথাগুলো সে গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করছে। এক পর্যায়ে নাজিয়ার কথা শেষ হলে সে বললো-

তবে কি টেলিফোন করার নিয়মও ইসলামে আছে?

নাজিয়া বললো- অবশ্যই আছে।

ঃ তবে এ সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

নাজিয়া ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো-

ঃ ঠিক আছে, এখন তাহলে টেলিফোন করার ইসলামী বিধান সম্পর্কে জানা যাক।

নাজিয়া বললো, টেলিফোন আধুনিক বিশ্বের এক অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম। কিন্তু এর যথেচ্ছ ব্যবহার এবং অন্য মানুষকে সময়ে অসময়ে টেলিফোন করে ব্যতিব্যস্ত ও পেরেশান করা শরিয়তের দৃষ্টিতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এতে শক্ত গোনাহ হয়। তাই গোনাহ থেকে বাঁচতে হলে নিম্ন বর্ণিত নিয়মানুযায়ী টেলিফোন করতে হবে।

১. একান্ত ঠেকা ছাড়া কারো কাছে এমন সময় ফোন করা যাবে না যখন তার ঘুম, অযীফা কিংবা বিশেষ কোনো কাজ বা আমলের ব্যাঘাত ঘটবে। কেননা এতে তার ঠিক ঐ রকমই কষ্ট অনুভূত হয় যেমন কষ্ট অনুভূত হয় বিনা অনুমতিতে তার ঘরে প্রবেশ করলে।

২. টেলিফোন করার জন্য সময় নির্ধারিত থাকলে ঐ নির্ধারিত সময়ই করতে হবে, অন্য সময় নয়।

৩. যার কাছে প্রায়ই কথা বলার প্রয়োজন হয়, তার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে যে, কোন সময় তার সাথে কথা বললে সুবিধা হবে। পরে সেই হিসেবে ফোন করতে হবে।

৪. টেলিফোন রিসিভ করার পর প্রথমেই সালাম দিতে হবে। অবশ্য সালাম যে কোনো কথার পূর্বেই হওয়া নিয়ম।

৫. হ্যালো কিংবা এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা ইসলামী রীতি নয়।

৬. যদি দীর্ঘ সময় কথা বলার প্রয়োজন হয় তবে প্রথমেই জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে যে, তার সময় হবে কিনা? কেননা অনেক সময় রিং হলে মানুষ যে কাজেই ব্যস্ত থাকুক না কেন, বাধ্য হয়ে রিসিভার উঠায়। এমতাবস্থায় অপর প্রান্ত থেকে দীর্ঘক্ষণ কথা বললে এ প্রান্তের ব্যক্তির কষ্টের সীমা থাকে না।

৭. অনেক সময় দেখা যায় রিং বেজেই চলছে, কিন্তু কেউ রিসিভ করছে না। এরূপ করা একেবারেই অনুচিত এবং মানবতা বিরোধী কাজ। কেননা কেউ যদি আপনার সাথে কথা বলতে চায়, তাহলে এটা তার অধিকার। তাই এ অধিকার বাস্তবায়নে অবশ্যই আপনাকে উদ্যোগী হতে হবে। এটা আপনার নৈতিক দায়িত্ব। হ্যাঁ, সে মুহূর্তে সময় দেয়া সম্ভব না হলে, নিজে বা অন্য কারো মাধ্যমে তা জানিয়ে দিতে হবে।

৮. যদি টেলিফোন রিসিভকারীর সাথে আপনার বহু আগের পুরাতন পরিচয় বা হালকা পরিচয় কিংবা আদৌ পরিচয় না থাকে অথবা গলার স্বরে আপনাকে চিনতে না পারে তখন নিজের পরিচয় পরিষ্কারভাবে দিয়ে তার দ্বিধা দূর করতে হবে। এ কথা বলে তাকে লজ্জা দেওয়া যাবে না যে, 'আমাকে চিনতে পারেন নি? দেখুন না চেষ্টা করে চেনা যায় কিনা ইত্যাদি।'

৯. সর্বোপরি, কথা বলার সময় কথা বলার সুন্নত ও আদব সমূহের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, মোবাইলে কথা বলার সময়ও একই নিয়ম প্রযোজ্য।[৪]

নাজিয়ার মুখ থেকে এসব কথা শুনে সকলেই হতবাক হয়ে গেল। নাজনীন তো আশ্চর্য হওয়ার ভঙ্গিতে বলেই ফেললো- ইসলামী বিধি-বিধান তাহলে এত সুন্দর! মানুষের সুবিধা-অসুবিধার দিকটি এত সূক্ষ্ম ভাবে লক্ষ্য রেখেছে ইসলাম!! ভাবী! আমাকে ক্ষমা করে দিন। গতকাল আমি ফোনের মাধ্যমে আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।

নাজিয়া বললো- না বোন, এ ব্যাপারটি তোমার জানা নেই বলেই এমনটি হয়েছে। আমি কিন্তু তোমাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য কথাগুলো বলি নি। এতদসত্ত্বেও যদি লজ্জা পেয়ে থাকো তবে তোমার নিকট ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টির প্রত্যাশী।

---

৪. প্রমাণ- তাফসীরে মারেফুল কুরআন ঃ ৬ সূরা নূর, ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া ২ঃ২৪৫, আহকামে জিন্দেগী ঃ ৩৯৫

ভাবী! আপনি এ কথা বলবেন না। সত্যি কথা বলতে কি, এই সামান্য সময় আপনার সংস্পর্শে থাকায় আমার অন্তর চক্ষু খুলে গেছে। আমি আপনার কাছে দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করে বলছি- প্রতি শুক্রবারের প্রোগ্রামে অবশ্যই আমি শরিক হবো।

এরপর ফারহানা ও আতিকা বেগমও অনুরূপ ইচ্ছা ব্যক্ত করলো। নাজিয়া বললো-

আতিকা মামানী তো আমার চেয়েও ভালো জানেন। দয়া করে আপনি যদি আসেন তবে আপনার মুখ থেকেও আমরা কিছু মূল্যবান কথা শ্রবণ করবো।

আতিকা বেগম বললেন, আমি তেমন কিছুই জানি না। আমি তো আর কুরআন কিতাব পড়ি নি। ধর্মীয় বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পড়ে যা পাই তা-ই আমার পুঁজি।

'তাতেই আমাদের চলবে।' বলে নাজিয়া অনুমতি নিয়ে রান্না ঘরে চলে গেলো।

বেলা একটার দিকে রান্না শেষ হলো। দেড়টার মধ্যে সকলেই যোহরের নামাজ আদায় করে খেতে বসলো। খানা শেষ হলে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে মেহমানরা বিদায় নিলো। বিদায়ের সময় সুন্নত হিসেবে গেইট পর্যন্ত তাদেরকে এগিয়ে দিলো নাজিয়া। মুখে বললো-

আসতাউ দি'উল্লাহা দ্বীনাকুম ওয়া আমানা তিকুম ওয়া খাওয়াতীমা আ'মালিকুম।

[তের]

সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রি। মাসুম প্রতিদিন ইশার নামাজ পড়িয়ে খুব বেশি একটা দেরি করে না। সেদিন মসজিদের সভাপতি কয়েকটি জরুরি মাসআলা নিয়ে আলোচনা তোলায় বাসায় ফিরতে প্রায় দশটা বেজে যায়।

গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ নাজিয়া একটি নিয়ম করে নিয়েছে। স্বামী যেহেতু সাজ সজ্জা পছন্দ করেন এ কারণে সে স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য এক রকম প্রতিজ্ঞাই করে নিয়েছে যে, প্রতিদিন সাধারণ সাজসজ্জা ও পরিপাটি হওয়া ছাড়াও প্রতি

বৃহস্পতিবার বিশেষভাবে সাজবে। উত্তম কাপড়-চোপড় ও অলংকার দিয়ে এমনভাবে সজ্জিত হবে, যেন তাকে নববধূ অনুমিত হয়। আজকে সেই রাত্র হওয়ায় তাহের-তামান্নাকে ঘুম পাড়িয়ে শ্বশুর শাশুড়ীকে খানাপিনা খাওয়ায়ে নিজের রুমে এসে মনের মতো করে সাজল। সাজে কোন খুঁত বা ত্রুটি রইল কিনা, স্বামীর পছন্দসই সবকিছু হলো কিনা আবার তা পরীক্ষা করলো। ঠিক এমন সময় সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতেই নাজিয়াকে দেখে মাসুমের মনে হলো, এতো কোন মানুষ নয়। এ যেন মেঘের আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা সূর্যের হাসি।

তখন নাজিয়ার পরিধানে ছিলো স্বচ্ছ রেশমী পোশাক। বড় হৃদয়গ্রাহী সে ভূষণ। কাপড় ও চেহারার একই ধরনের রঙ। গায়ের রঙ্গের সঙ্গে বেশভূষার চাকচিক্য মিলে সেই উজ্জ্বল্য বেড়ে গিয়েছিলো শতগুণ। তার অধর ও ওষ্ঠদ্বয়ের খুনরাঙ্গা সৌন্দর্যচ্ছটা সাদা পোশাকের মাঝেও ঝলসাচ্ছিল রীতিমতো। চন্দ্ররূপিণী নাজিয়া আজ যেন সৌন্দর্যের স্ফুলিঙ্গ হয়ে জ্বলে উঠেছে। অলংকার শোভিত তার লাবণ্য বিস্ময়কর সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তার কান্তি ও দীপ্তির অভাবনীয় ঝলকে চোখ ঝলসে যাবে যেন। মনে হচ্ছিল, পূর্ণিমার চন্দ্রকেও সে হার মানাবে। সৌন্দর্যচ্ছটায় সূর্যকেও বুঝি পিছনে ফেলে দিবে।

স্বামী ঘরে প্রবেশ করতেই নাজিয়া তার চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী বিছানায় যাওয়ার আগেই নিজের সমস্ত সত্ত্বাকে স্বামীর নিকট সোপর্দ করে। স্বামী বড়ই তৃপ্তির সাথে স্বামী-স্ত্রী সুলভ আচরণে ডুবে গেলে সেও প্রতিদানে মেতে উঠে। কিছুক্ষণ পর উভয়ে বালিশে মাথা রাখে। বিভিন্ন রকম হাসি-কৌতুক করে। দীনি মেহনত কে কতটুকু করলো, সামনে কি করা উচিত এ নিয়েও আলোচনা করে।

এক পর্যায়ে টুকটুকে ডালিম রাঙ্গা গন্ডের দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে মাসুম বলে-

নাজিয়া! তুমি এমন এক প্রাণ সজনী যার একটি ইশারা, একটু স্নিগ্ধ হাসি, এক ফোটা অশ্রু ও সামান্য অনুরোধ আমার ফয়সালাকে বানচাল করে দিতে পারে। সুতরাং আমি চাই, অতীতে তুমি যেমন অনেক ভেবে চিন্তে আমার সাথে কথা বলেছো, বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছো ভবিষ্যতেও তা-ই করবে।

নাজিয়া! শুধু তা-ই নয়, আমি তোমার নিকট পূর্বের ন্যায় আজীবন এও

চাইবো যে, তুমি যোগাবে আমার মনে দুর্দমনীয় সাহস আর উৎসাহ, যোগাবে সান্ত্বনা আর শক্তি, দেবে প্রেম ভালোবাসা উজাড় করে। দেবে স্নেহ-প্রীতি আর প্রেরণা। আমি তোমার কাছে চাইবো আমার অতৃপ্ত হৃদয়ের অফুরন্ত খোরাক। বলো, পারবে দিতে?

মাসুমের উষ্ণ চাউনি দেখে নাজিয়া পুলকিত হলো। তার কথাগুলো যেন অন্তরে মধু বর্ষণ করলো। বললো, অবশ্যই প্রিয়তম, অবশ্যই। দুআ করবেন আমি যেন আপনার আশা মৃত্যু পর্যন্ত পূর্ণ করে যেতে পারি। সত্যি বলতে কি, যে উচ্চাশা ও আস্থা পেয়েছি আপনার থেকে, তা আমার নারী জীবনের পরতে পরতে ফুটন্ত গোলাপের মতোই চিরকাল বিকশিত হতে থাকবে।

মাসুম সৌম্য সুন্দর দীপ্তকায় যুবক। মাথায় একরাশ কালো চুল। গভীর দুটো চোখ। হাস্যোজ্বল মুখমণ্ডল। নাজিয়া যখন একাকী থাকে তখন মাসুমের সেই হাসি, সেই কথার সুন্দর ভঙ্গি, সেই অপূর্ব মনোমুগ্ধকর আঁখি তার কল্পনার আয়নায় ভেসে উঠে। তখন ছুটে এসে ওর প্রশস্ত বক্ষে মাথা রাখতে ইচ্ছে করে। অবশ্য নাজিয়া শুধু মাসুমের সৌন্দর্যেই অভিভূত ছিলো না, তার পুরুষোচিত আচরণেও বিমুগ্ধ ছিলো। স্বামীর আবেগ মাখা কণ্ঠ তাকে যেমন করতো আত্মহারা, তেমনি তার পৌরুষভরা কণ্ঠস্বর ওকে করে তুলতো ভীত। তাই মাসুম কোনো কারণে রাগান্বিত হলে ওর সামনে যেতে সাহসী হতো না নাজিয়া।

রাতে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তার পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মাসুম তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য শেষ রাত্রে জেগে উঠে নাজিয়াকেও ডাকতে থাকে। নাজিয়া উঠতে গড়িমসি করলে মাসুম সামান্য পানি নিয়ে তার মুখে ছিটিয়ে দেয়। কেননা, তাহাজ্জুদ সম্পর্কিত একখানা হাদীসের উপর আমল করার জন্য তারা পূর্বেই একথা পাকাপাকি করে নিয়েছে যে, শেষ রাতে যে আগে উঠবে সে অপরজনকে জাগিয়ে দিবে। দেরি করলে মুখে পানি ছিটিয়ে দিবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ পাক সে ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করেন, যে ব্যক্তি রাতে উঠে (তাহাজ্জুদের) নামাজ পড়ে এবং স্ত্রীকে জাগিয়ে দেয় এবং সেও নামাজ পড়ে। আর যদি স্ত্রী অস্বীকার করে তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। অনুরূপ আল্লাহপাক দয়া প্রদর্শন করেন সে স্ত্রী লোকের উপর যে রাতে উঠে নামাজ পড়ে এবং স্বামীকেও জাগিয়ে দেয় এবং সেও

নামাজ পড়ে। আর স্বামী তাতে অস্বীকার করলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়।[৫]

হযরত বেলাল (রা.) থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতে উঠা অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়া তোমাদের উপর জরুরি। কেননা, এটা হচ্ছে তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের অভ্যাস। তোমাদের প্রভুর নৈকট্য লাভের পন্থা। গুনাহ মাফের উপায় এবং অন্যায় অপরাধ থেকে বাধা দানকারী।[৬]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন (অর্থাৎ এ বার্তা নিয়ে বিশেষ হুকুম অবতীর্ণ হয় যে,) আছো কি এমন কোনো ব্যক্তি, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিবো। আছো কি এমন কেউ, যে আমার নিকট কিছু চাইবে? আমি তাকে দান করবো। আছো কি কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী? আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো।[৭]

অফুরন্ত ছওয়াব প্রাপ্তি ছাড়াও তাহাজ্জুদ নামাজের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও ফজিলত হলো, এর দ্বারা শরীরের রোগ উপশম হয়, রোগ দূর হয়। ফাতহুল মারাম গ্রন্থকারের পিতা হযরত কাজী আজীজ আহমদ সাহেব বলেন, আমি প্রত্যেক অসুখের নিরাময় তিনটি জিনিসের মধ্যে পাই। (১) মধু, স্বয়ং আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে মধুকে শেফা বা রোগ আরোগ্যকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। (২) কালো জিরা, হাদীসে একে মৃত্যু ব্যতীত সমস্ত রোগের ঔষধ বলা হয়েছে। (৩) তাহাজ্জুদ নামাজ, হাদীসে একে অসুখ দূরকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

তাহাজ্জুদ নামাজের এ সমস্ত ফজিলতের কারণে মাসুম-নাজিয়া নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ে। এমনকি শরীর ক্লান্ত হলে এবং শেষ রাতে উঠার ব্যাপারে নিশ্চিত না হলে ঘুমানোর পূর্বেই তারা দুই/চার রাকাত পড়ে নেয়।

---

৫. আবু দাউদ ১ঃ১০০ # মেশকাত ঃ১০৯। (উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীসে পানি ছিটানোর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাকে জাগানোর সব রকম কৌশল অবলম্বন করা। যেহেতু চোখে পানির ছিটা পড়লে ঘুম তাড়াতাড়ি ভাঙ্গে তাই পানির ছিটার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।)

৬. তিরমিযী ২ঃ১৯৫ # মেশকাত ঃ ১০৯

৭. বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ

আজ নামাজ শেষে মোনাজাতের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েই হাত উঠায়। মাসুম বলে- হে করুণাময় আল্লাহ! আমরা তোমার দীন প্রচারের জন্য যেসব কাজে হাত দিয়েছি, এসব কাজকে তুমি সফলতার মুখ দেখাও। তোমার সাহায্য ও মদদ আমাদের নসীব কর। আমাদের স্বামী স্ত্রীর মহব্বতকে আরোও বাড়িয়ে দাও। তাহের-তামান্নাকে তোমার দ্বীনের জন্য কবুল কর। আখেরাতের জন্য আমাদের সবাইকে পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুতি নেওয়ার তাওফীক দাও।

নাজিয়া বললো- আমীন। অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমি (আমাদের দুআকে) কবুল কর।

[চৌদ্দ]

আজ ২৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার। দেখতে দেখতে বহু কাঙ্খিত মহা সম্মেলনের প্রথম দিনটি আজ উপস্থিত। সম্মেলন প্রস্তুতির অংশ হিসাবে আগেই বি.বাড়ীয়া ও আশে পাশের জিলাগুলোতে ব্যাপক পোষ্টারিং ও মাইকিং করা হয়েছে। লোকজন দলে দলে মাঠে এসে সমবেত হচ্ছে। মাগরিব নাগাদ বিশাল মাঠ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো। মহিলারাও সমবেত হলো তাদের নির্ধারিত পর্দাঘেরা স্থানে।

নাজিয়াদের বাসায় সাপ্তাহিক দ্বীনি প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার পর থেকে এখনো পর্যন্ত তা অব্যাহত গতিতে অত্যন্ত সফলতার সাথে চলে আসছে। এ প্রোগ্রামের ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে, এলাকার প্রতিটি পরিবারে দ্বীনি সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকে নামাজ পড়তে শুরু করেছে। অনেকে টিভি, ভিসিডি, সিনেমা ইত্যাদি দেখা বন্ধ করে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ শরয়ী পর্দা পালনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে। তাছাড়া ধর্ম ও ধর্মের বিধি-বিধান সম্পর্কে জানার এক অদম্য আগ্রহ সবার মধ্যেই ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে। তাই তো তিন দিন ব্যাপী মহাসম্মেলনের প্রথম দিনে এলাকার মেয়েদের সংখ্যাও ছিল উল্লেখ করার মতো।

মহাসম্মেলনে প্রথম দিনের সভাপতি ছিলেন বয়োজেষ্ঠ ও প্রখ্যাত আলেমে দীন পীরে কামেল আল্লামা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আহমদ কবীর সাহেব। প্রধান অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখুল হাদীস আল্লামা আলহাজ্ব আখতারুজ্জামান কাসেমী সাহেব। বিশেষ

অতিথি ছিলেন অসংখ্য মানুষের আধ্যাত্মিক রাহবার পীরে কামেল হযরত মাওলানা ইব্রাহীম খলিল সাহেব।

নাজনীন ও ফারহানা এতদিনে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখে ফেলেছে। তৈরি হয়েছে দীনী মেজাজ। নাজনীন তো নাজিয়ার পরামর্শে বাসায় একটি ধর্মীয় পাঠাগারই প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। নাম দিয়েছে আল হেরা পারিবারিক পাঠাগার। এ নামটি অবশ্য নাজিয়াই ঠিক করে দিয়েছে। দীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়াশুনা করার নির্দেশ সম্বলিত পবিত্র কুরআনের প্রথম পাঁচটি আয়াত ঐ হেরা গুহাতে অবতীর্ণ হয়েছিল বিধায় নাজিয়া এ নামটি পছন্দ করেছে।

নাজনীনের পিতা হাশেম খান বুড়ো হয়ে গেছেন। বাইরে খুব একটা বের হন না। অধিকাংশ সময় বাসায় শুয়ে বসে কাটান। সময় যেনো তার কাটতে চায় না। তাই ধর্মীয় বইয়ের প্রতি চরম অনীহা সত্ত্বেও সময় কাটানোর জন্য নাজনীনের পাঠাগার থেকে মাঝে মধ্যে দু একটি বই নিয়ে পড়েন। এভাবে বেশ কয়েক মাস পড়ার পর তার মনোজগতেও একটা পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। ইসলাম ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ ভাব এখন আর আগের মতো নেই। বলতে গেলে ধর্মের প্রতি বিদ্বেষের স্থলে ক্ষীণ ভালবাসাই অঙ্কুরিত হয়েছে তার হৃদয়ের গহীন কোণে।

হাশেম সাহেবের এ পরিবর্তন মাসুমের দৃষ্টি এড়ায় নি। সে তাকে আরো অগ্রসর করার জন্য প্রায়ই তার সাথে দীনি কথাবার্তা আলোচনা করে। চাচা বলে সম্বোধন করে। শারিরীক অবস্থার খোঁজ-খবর নেয়। সময় সময় নিকটস্থ মারকাজ মসজিদে বয়ান শুনানোর জন্য নিয়ে যায়। যাতায়াত ভাড়া সে নিজেই বহন করে। এভাবে কিছুদিনের মধ্যে মাসুমের সাথে হাশেম খানের হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠে।

প্রায় দশ দিন পূর্বেই মাসুম তাকে মহাসম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দাওয়াত দিয়েছিলো। উত্তরে হাশেম খান বলেছিলেন, আল্লাহ যদি শরীরটা ভাল রাখেন তবে অবশ্যই তোমার কথা রাখবো।

মহাসম্মেলনের ১ম দিন মাসুম মাগরিবের আগেই খান সাহেবকে নিয়ে স্টেইজে উপস্থিত হয়। মাগরিব বাদ পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত ও হামদ নাতের পর শুরু হয় বিষয় ভিত্তিক বক্তৃতার পালা। সভাপতি সাহেব ইতোমধ্যেই তার আসন অলংকৃত করেছেন। প্রথম বক্তা ছিলেন মাওলানা

নাঈমুর রহমান আনছারী সাহেব। মাওলানা সংক্ষিপ্ত খুতবা শেষে মূল বয়ান শুরু করবেন ঠিক এমন সময় প্রধান অতিথি আল্লামা আখতারুজ্জামান কাসেমী ও বিশেষ অতিথি হযরত মাওলানা ইব্রাহীম খলিল সাহেব স্টেইজের অদূরে গাড়ি থেকে অবতরণ করেন। এ খবর স্টেইজে পৌছতেই আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে সকলে সমস্বরে বলতে লাগলো-

নারায়ে তাকবীর - আল্লাহু আকবার।

শাইখুল হাদীসের আগমন- শুভেচ্ছা স্বাগতম।

প্রধান অতিথির আগমন- শুভেচ্ছা স্বাগতম।

বিশেষ অতিথির আগমন- শুভেচ্ছা স্বাগতম।

পীর সাহেবের আগমন- শুভেচ্ছা স্বাগতম।

নারায়ে তাকবীর- আল্লাহু আকবার।

অতিথিদ্বয় স্টেইজের দিকে ধীরে পদে এগিয়ে চলছেন। তাদের পিছনে অনেক লোক। সামনের লোকজন পরম শ্রদ্ধার সাথে আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম দিচ্ছে। মোসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়েছে দিচ্ছে অশেষ ভক্তি সহকারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অতিথিদ্বয় নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন।

এদিকে হাশেম খান নির্বাক। অপলক নেত্রে তাকিয়ে দেখছেন এসব দৃশ্য। চরম ইসলাম বিদ্বেষী হওয়ায়, বয়স অনেক হলেও এসব ওয়াজ-মাহফিল ও সম্মেলন-মহাসম্মেলনে কোনো দিন যান নি তিনি। সুতরাং এরূপ দৃশ্য তার নিকট নতুন লাগাই স্বাভাবিক। বৃদ্ধ মানুষ দুটোর এ অভূতপূর্ব সম্মান দেখে রাজ্যের বিস্ময় ঝরে পড়ে তার দু'চোখে। তিনি ভাবতে থাকেন, মাদরাসা শিক্ষা ও হুজুর মাওলানাদের সম্বন্ধে আমি যা ধারণা করতাম তবে কি তা মিথ্যা? তিনি চিন্তা করেন- মাওলানা সাহেবরা সাধারণ চাকুরী-জীবিদের মতো রিটায়ার্ড হন না কেন? সরকারি চাকুরীজীবী যত বড়ই হোক না কেন ষাট পয়ষট্টি বয়স হলেই চাকুরি শেষ। সাথে সাথে নিঃশেষ হয়ে যায় সমস্ত দাপট ও প্রভাব। কিন্তু হুজুরদের বেলায় এমনটা হয় না কেন? আজকে যে অভাবনীয় দৃশ্য দেখলাম, তাতে তো একথাই প্রমাণিত হয় যে, বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের ইজ্জত সম্মান ও প্রভাব আরো বাড়তে থাকে। এর পিছনে কারণ কি? ব্যাপারটা ভাবিয়ে তোলে রিটায়ার্ড দারোগা হাশেম খানকে।

হাশেম খানের পাশেই বসা ছিল মাসুম। তিনি ভেবেছিলেন মাসুমকে চুপি চুপি কথাটি জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু এমন সময় বক্তৃতা শুরু হয়ে যাওয়ায় জিজ্ঞেস করা হলো না। সিদ্ধান্ত নিলেন- বাসায় যাওয়ার পথে কিংবা অন্য কোন সময় মাসুমের সাথে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ করবেন।

বক্তৃতা দিচ্ছিলেন মাওলানা নাঈমুর রহমান আনসারী সাহেব। তাঁর মূল আলোচ্য বিষয় ছিল জেনারেল শিক্ষা বনাম মাদরাসা শিক্ষা। তিনি প্রথমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উভয় শিক্ষার পরিচয়, প্রয়োজনীয়তা ও লাভ ক্ষতির দিকটি শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন। সেই সাথে উল্লেখ করেন মাদরাসা শিক্ষা তথা ইলমে দ্বীন অর্জনের ফজিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত প্রচুর হাদীস ও পবিত্র কুরআনের বেশ কিছু আয়াত। তারপর এক পর্যায়ে তিনি বলেন-

আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আজ আমরা অনেকে মনে করি, আমার ছেলেকে দীনি শিক্ষা দিলে, কওমী মাদরাসায় পড়াশুনা করালে ভবিষ্যতে সে কিভাবে চলবে, কিভাবে সংসার চালাবে? কী খেয়ে জীবন ধারণ করবে? তাদের কোনো সরকারি সার্টিফিকেট নেই, নেই সরকারি চাকুরী ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপস্থিত তাওহীদি জনতা! দুনিয়াতে মানুষ জেনারেল শিক্ষা অর্জন করে ভালো খাওয়া পরার জন্য, শান্তি মতো বসবাসের জন্য এবং মান সম্মানের সাথে থাকার বাসনায়। আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখুন তো, যারা প্রকৃত দীনি শিক্ষা অর্জন করে, যারা সত্যিকার আলেম হয় তারা উল্লেখিত বস্তুগুলির কোন্‌টি কম পেয়েছে? কম তো পায়নি বরং বেশি পেয়েছে। আপনারা হয়তো জানেন যে, এখনো বাংলাদেশের হাজারো গ্রাম ও এলাকা রয়েছে যেখানকার লোকজন আলেম মাওলানাদেরকে একটু আদর আপ্যায়ন করার সুযোগ পাওয়াকে নিজের জন্য বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করে। পরম আগ্রহ ভরে বাজারের সেরা মাছটি, সুন্দর মুরগিটি হুজুরদের জন্য ক্রয় করে আনে। তারা মেজবানের বাসায় পৌঁছলে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও মহব্বতের সাথে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানায় ও সাদরে গ্রহণ করে।

প্রিয় শ্রোতামন্ডলী! আপনারা আজ খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখুন, কয়জন জেনারেল শিক্ষিত বি. এ পাশ, এম. এ. পাশ বেকার আছে আর কয়জন খাঁটি আলেম বেকার আছে। হিসাব করলে হয়তো দেখা যাবে যে, হাজার হাজার জেনারেল শিক্ষিত বেকারের তুলনায় দু'চারজন বেকার আলেম

পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। জেনারেল শিক্ষা অর্জন করে সরকারি চাকুরী তো দূরের কথা সাধারণ চাকুরী জুটাতেও হিমশিম খেতে হয়। বলতে গেলে চাকুরী যেনো আজ সোনার হরিণে পরিণত হয়েছে।

সম্মানিত ভাইয়েরা আমার! প্রকৃত আলেমদের চলাফেরা থাকা-খাওয়া, পোশাক আশাক প্রভৃতির দিকে নজর বুলিয়ে দেখুন। কোনোটাই তাদের কমতি নেই।

এতটুকু বলে মাওলানা সাহেব মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির দিকে লক্ষ্য করে বললেন- দেখুন, আজ আমাদের শাইখুল হাদীস ও পীর সাহেবকে। চোখ দুটো খুলে দেখুন- গোটা দেশে তাদের কী মান-ইজ্জত। কই, তাদের তো কোনো সরকারি সার্টিফিকেট নেই। তারা তো কোনো সরকারি চাকুরীও করেন না। তারপরও তাদের এত সম্মান কেন? কেন তারা এত শান্তি ও ইজ্জতের সাথে বসবাস করছেন? এর দ্বারা কি এ কথাই বুঝা যায় না যে, সরকারি সার্টিফিকেট আর সরকারি চাকুরীই মান সম্মান আর শান্তির মানদণ্ড নয়। বরং আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা শান্তিতে রাখেন, প্রভূত সম্মান দান করেন। যারা আল্লাহর বাণী কুরআন ও রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠন করেন আল্লাহপাক তাদেরকে দুনিয়াতে ও আখেরাতে বিশেষ শান্তিতে রাখেন, বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন।

আপনারা হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, অনেক সময় তো হুজুরদের দেখি কিছু টাকার জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে। এর জবাবে আমি বলবো, এসব তারা নিজেদের জন্য করেন না। বরং প্রতিষ্ঠানের জন্য, প্রতিষ্ঠানের এতিম গরিব ছাত্রদের জন্য করে থাকেন। আসলে বিত্তবানদের দায়িত্ব ছিল দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে খেয়াল রাখা, এগুলোর খোঁজ খবর নেওয়া এবং নিজেরা সেখানে গিয়ে প্রয়োজন পরিমান টাকা পয়সা সেখানে দিয়ে আসা। কিন্তু বিত্তবানদের অনেকেই এ দায়িত্ব অবহেলা করার দরুণ দীনি প্রতিষ্ঠানগুলোকে চালু রাখার স্বার্থে হুজুরদেরকেই আজ তাদের কাছে যেতে হচ্ছে। সুতরাং এ কথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, ধনী ও বিত্তবানরা যদি তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথ পালন করেন, তবে হুজুর মাওলানাদের আর মানুষের কাছে যেতে হবে না। মোটকথা, দায়িত্বশীলরা তাদের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি ও যথেষ্ট অবহেলার পরিচয় দেওয়ার কারণে হুজুরদেরকে এ কষ্টটুকু করতে হচ্ছে।

অতঃপর মাওলানা সাহেব আপন জীবনের স্মৃতি স্মরণ করে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বললেন, একদিন আমি আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু মাওলানা মাসুমের বাসায় যাচ্ছিলাম। তখন আমি মিশকাত জামাতে পড়ি। বয়স পনের কি ষোল হবে। যাচ্ছিলাম বাসে চড়ে। ঐ সময় ঘটনাক্রমে আমার পাশে বসা ছিলেন এক দারোগা সাহেব। তিনি থানায় যাচ্ছিলেন। সাথে ছিলো আরো কয়েকজন পুলিশ। চেহারা দেখে বুঝা গেলো তিনি বেশ দাপটের লোক। দারোগা সাহেব আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন এবং লেখাপড়া সম্পর্কে কথোপকথনের এক পর্যায়ে বলেই ফেললেন- মাদরাসায় পড়ে মোল্লা সেজে কী খাবে? তোমাদের না আছে সরকারি সার্টিফিকেট, না আছে চাকুরী। শুধু শুধু জীবনটা নষ্ট না করে স্কুল কলেজে পড়াশুনা কর। জীবনটাকে কাজে লাগাও। মাদরাসার ঐ ফকিরী বিদ্যা পড়ে পেটে ভাত জুটবে না।

অল্প বয়স ও স্বল্প সাহসী হওয়ার কারণে সেদিন একজন দারোগার কথার জবাবে কথা বলার হিম্মত আমার হয় নি। কিন্তু আজ যদি আমি তার সাক্ষাত পেতাম তবে বলতাম, দেখুন আমি কী করে খাচ্ছি, কেমন চলছি।

হাশেম খান মাওলানার বক্তব্যগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনছিলেন। কিন্তু দারোগা শব্দটি কানে আসতেই তিনি চমকে উঠলেন। অস্ফুট স্বরে বললেন, হ্যাঁ, আমিই তো সেই দারোগা। আমিই তো বহুদিন পূর্বে একটি মাদরাসার ছাত্রকে অবজ্ঞার সুরে এ কথা বলেছিলাম। তবে কি সেই ছেলেই এই মাওলানা সাহেব? তন্ময় হয়ে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মাওলানার দিকে। খুব করে দেখলেন তাকে। হ্যাঁ, তার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মালো, এই হলো সেই ছেলে।

এ সময় খান সাহেব খুব টেনশন ফিল করলেন। বুঝতে পারলেন নিজের ভুল। মনে মনে বললেন- জীবনে প্রকৃত শান্তি, সুখ ও সম্মান মূলতঃ এসব আলেম ওলামারাই পেয়েছেন, তাদের জীবনই প্রকৃত সফল। তারাই কৃতকার্য। আমাদেরকে তো লোকজন শক্তি ও অর্থের দাপটে সালাম দেয়, শ্রদ্ধা করে। কিন্তু এ শ্রদ্ধা ও সম্মান কখনোই প্রকৃত শ্রদ্ধা ও প্রকৃত সম্মান হতে পারে না। যার বাস্তব প্রমাণ আমি নিজেও। কারণ যতদিন আমার পাওয়ার ছিলো ততদিন আমার সম্মান ছিলো। ইজ্জত ছিলো। আসতে যেতে সেলুট পেতাম। কিন্তু এখন? এখনতো বাইরের লোক দূরের কথা ঘরের পূত্রবধূ পর্যন্ত দেখতে পারে না। আমাকে একটি বোঝা মনে করে। আর এসব

মাওলানারা বুড়ো হয়ে যাওয়ার পর তাদের কতো সম্মান, কতো ইজ্জত! হায়!! এ কথা যদি ছোট বেলায় বুঝতে পারতাম.....।

এসব কথা চিন্তা করতে করতে হাশেম খান কেমন যেন হয়ে গেলেন। তার সমস্ত শরীর ভিজে চুপসে গেলো। পাশে বসা মাসুমকে বললেন- মাওলানা! আমার যেন কেমন লাগছে। চলুন বাড়ির দিকে রওয়ানা দেওয়া যাক। মাসুমও লক্ষ্য করল, হাশেম খান কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করছেন। ভাবলেন, বয়স্ক মানুষ না জানি কখন কি হয়। তাই একান্ত অপারগ হয়েই খান সাহেবকে নিয়ে বাসার দিকে রওয়ানা দিলেন।

হাশেম খানের দুই নাতি। একজনের নাম নাঈম অপর জনের নাম ফাহিম। নাঈমের বয়স সাত বছর। ফাহিম নাঈমের দু বছরের ছোট। হাশেম খান স্টেইজে থাকতেই দুই নাতিকে মাদরাসায় পড়ানোর জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। তাই পথিমধ্যে মাসুমকে বললেন-

ঃ মাওলানা! মাদরাসার ভর্তি কবে থেকে শুরু হয়?

ঃ রমজানের পর শাওয়ালের দশ তারিখ থেকেই সাধারণত ভর্তি শুরু হয়। কেন, কি জন্য? হঠাৎ করে মাদরাসার ভর্তির ব্যাপারে জানতে চাচ্ছেন যে!

ঃ নাঈম ও ফাহিমকে মাদরাসায় পড়ানোর ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাই জানতে চাইলাম।

ঃ এ সিদ্ধান্তের পিছনে কোনো কারণ আছে কি?

ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। এতটুকু বলে খান সাহেব মাসুমের কাছে সবকিছু খুলে বর্ণনা করলেন। সেই সঙ্গে অত্যন্ত জোর দিয়ে এও বললেন যে, মাদরাসা শিক্ষার প্রতি আমার পূর্বের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। আল্লাহ পাক আমার সেই ভুল ভেঙ্গে দিয়েছেন এজন্য হাজারো শুকরিয়া।

ঃ হ্যাঁ শুকরিয়ার ব্যাপারেই বটে বলে মাসুম তাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে পুনরায় সম্মেলনে চলে আসে।

[পনের]

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনেও দেশের প্রখ্যাত আলেমগণ নির্ধারিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। আজ সম্মেলনের তৃতীয় ও শেষ দিন। আজকের প্রধান আকর্ষণ হলেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক নদভী সাহেব। তার বক্তব্য শুনার জন্য বহু দূর দূরান্ত থেকে লোকজন এসে সমবেত হয়েছেন। পূর্বের দুদিনের তুলনায় আজকের লোক সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি। মাঠে সংকুলান না হওয়ায় লোকজন রাস্তায়, কলেজ ও স্কুলের ছাদে জায়গা নিয়েছে।

নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নদভী সাহেবের বক্তব্য সমাপ্ত হওয়ার পর শ্রোতাদের অনুরোধে সম্মেলন কর্তৃপক্ষ মাওলানার সাথে পরামর্শ করে প্রশ্নোত্তরের জন্য দেড় ঘন্টা সময় বরাদ্দ করেন। মাইকে ঘোষণা করা হয়- এখনকার এ প্রশ্নোত্তর পর্ব নারী-পুরুষ সবার জন্য। এ পর্বে অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ভাই বোনদের অনুরোধ করে বলছি- আপনারা নাম ঠিকানাসহ নিজ নিজ প্রশ্ন কাগজে লিখে স্টেইজে পাঠিয়ে দিন। ইনশাআল্লাহ, আমাদের হযরত এসব প্রশ্নের সুন্দর ও সঠিক জবাব প্রদান করবেন।

শুরু হলো প্রশ্নোত্তর পর্ব। প্রথমেই প্রশ্ন এলো মেয়েদের পক্ষ থেকে। প্রশ্নটি পাঠিয়েছে ফারহানা। তার প্রশ্ন হলো, 'ফ্যাশন কি? ফ্যাশনের পরিচয় ও বর্তমানে প্রচলিত দু'একটি ফ্যাশন সম্পর্কে আলোচনা করলে সকলেই উপকৃত হতাম।'

মাওলানা বললেন- ফ্যাশন একটি বহুল প্রচলিত ইংরেজী শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হলো, সৌখিন রীতি, প্রথা, রেওয়াজ ইত্যাদি। পশ্চিমা সভ্যতায় আক্রান্ত কথিত আধুনিক নারী-পুরুষদের দৃষ্টিতে ইসলাম পরিপন্থী প্রতিটি বিষয়ই সুন্দর ও উন্নতির পরম কাঙ্খিত সিড়ি বলে মনে হয়। কথিত আধুনিকতার পতাকাবাহীরা অমঙ্গলজনক অকাম্য এই বিষয়গুলোরই নাম দিয়েছে ফ্যাশন।

ফ্যাশন একটি আত্মিক ব্যাধি। এই ব্যাধি এখন মহামারীর রূপ ধারণ করে বসেছে। শেকড়-বাকড় ছড়িয়ে সমাজের অতল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। তবে মজার ব্যাপার হলো, এ ক্ষেত্রে যারা রুগ্ন ও ব্যাধিগ্রস্ত, তারা নিজেদেরকে মনে করে পূর্ণ সুস্থ। আর যারা সত্যিকার অর্থে সুস্থ, তাদেরকে মনে করে অসুস্থ। এর কারণ হলো, যারা আত্মিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তারা

রীতিমতই নিজেদেরকে সুস্থ মনে করে। তারা ভুলেও নিজেদেরকে অসুস্থ মনে করে না। টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেকে অসুস্থ মনে করে। তাই সে সুস্থ হতে সচেষ্ট হয়, চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। চেষ্টা তদবীর করে। কিন্তু বিভিন্ন আত্মিক ব্যাধি যেমন অহংকার, পরনিন্দা, ফ্যাশন পূজা প্রভৃতিতে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেকে আদৌ ব্যাধিগস্ত মনে করে না। বরং কোনো চিকিৎসক যদি তাদেরকে অসুস্থ বলে তাহলে তারা উল্টো ওই চিকিৎসককেই বেওকুফ ও আহমক ঠাহর করে বসে। আত্মিক ব্যাধি শারীরিক ব্যাধির চেয়েও মারাত্মক। এই ব্যাধি মানুষের দীন দুনিয়া উভয়টাই ধ্বংস করে ছাড়ে।

ফ্যাশন হলো সময়ের রঙ্গিন রূপ। সময় যেভাবে চলমান, ফ্যাশনও তেমনি চলমান। সময় বদলায়, তার সাথে ফ্যাশনও বদলায়। আজ যে ফ্যাশন সর্বত্র নন্দিত, কালই তা সকলের কাছে নিন্দিত। আজকের ফ্যাশন তারকারা গতকালের ফ্যাশনকে ওল্ড ফ্যাশন নাম দিচ্ছে আর নতুন ফ্যাশনকে বরণ করছে লেটেষ্ট ফ্যাশন হিসেবে। প্রতিটি কালই আবর্তিত হচ্ছে ফ্যাশনের একটি নতুন মোড়কে। প্রতিটি প্রভাতই নতুন নতুন ফ্যাশনের আগমন বার্তা শোনায়। আর এই ফ্যাশনের ভুবনে জয়জয়কার হলো পশ্চিমা সভ্যতার, পশ্চিমা সংস্কৃতির।

পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলতে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা ইত্যাদি কথিত উন্নত দেশের সভ্যতাকেই বুঝায়। আর ওসব দেশের ফ্যাশন ও প্রচলিত সমাজরীতি, চলমান চাল-চলন, পোশাক আশাক আধুনিক বিশ্বের সর্বোন্নত ফ্যাশন হিসেবে বিবেচিত ও সাদরিত। তবে ফ্যাশনের ওই দমকা হাওয়া শুধুই চাল-চলন আর পোশাক আশাকের মধ্যেই থেমে থাকেনি বরং আমাদের বিস্তীর্ণ জীবন সংসারের সর্বত্রই ঝড় বইছে এখন সেই হাওয়ার। লেনদেন, আদান-প্রদান, চেহারা-সূরত, পোষাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা, ঘর-দোর, শিক্ষা-সাহিত্য তথা জীবনের প্রতিটি অঙ্গনই এখন এই আধুনিক ফ্যাশন দোলায় আন্দোলিত। পশ্চিমা সভ্যতার ডোরে বাঁধা এক অদৃশ্য সুতোয় নিয়ন্ত্রিত আজ আমাদের সমাজ জীবন, আমাদের যাপিত জীবন ধারা।

শয়তান আমাদের প্রকাশ্য দুশমন। শয়তানের অসংখ্য ফাঁদের মধ্যে আরেকটি নতুন ফাঁদ হলো ফ্যাশন পূজা। এই ফ্যাশনের ফাঁদে পড়ে দ্বীন

দুনিয়া হারিয়ে প্রতিটি মুসলমান দেউলিয়া হয়ে ঘুরুক- এটাই হলো শয়তানের প্রত্যাশা। তার সে প্রত্যাশা এখন বাস্তবতায় রূপায়িত হচ্ছে। তাই সে খুশিতে আজ আটখানা। কথা ছিলো মুমিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রচিত হবে প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ও আদর্শ। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আজ আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দখল করে আছে আধুনিক রঙ্গিলা ফ্যাশন। আমরা আলেয়াকে আলো ভেবে বরণ করেছি। নবীর শাশ্বত জীবন দর্শনকে বিকিয়ে দিয়েছি কথিত আধুনিক ফ্যাশনের সস্তা সওদার বিনিময়ে।

প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ! প্রশ্নকারিণী আমার নিকট কতিপয় ফ্যাশনের উদাহরণ চেয়েছেন। সুতরাং আসুন আমরা এবার ফ্যাশনের ভুবনে প্রবেশ করি এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে দেখি, ফ্যাশনবাদের অন্ধ আনুগত্য করতে গিয়ে কিভাবে আল্লাহর হুকুম ও রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোকিত সুন্নতকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।

ফ্যাশনের সূচনা হয় চেহারা সূরত আর আকার আকৃতি থেকেই। চেহারা সূরত বলতে সাধারণত দাড়ি গোঁফ ও চুলের ফ্যাশনকেই বুঝায়। তাই আমরা প্রথমে দাড়ি ও গোঁফ দিয়েই শুরু করছি।

১. অসংখ্য হাদীস নবী রাসূল ও হযরত সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, প্রতিটি মুসলমানের জন্য কমপক্ষে এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ক্লিনসেভ করা, কেটে ছেটে এক মুষ্টির চেয়ে ছোট করা ফ্যাশন, মাকরুহে তাহরীমি।

২. গোঁফ ছোট করে রাখা সুন্নত, আর দীর্ঘ করে রাখা ফ্যাশন। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা গোঁফ ছোট করো আর দাড়ি লম্বা করো।[৮] কিন্তু ফ্যাশন প্রিয় মুসলমানরা প্রাণ খুলে দাড়ি মুণ্ডন করছে। ক্লিনসেভ মুখাবয়বই তাদের অহংকার। ফ্যাশনের নেশায় উম্মাদ হয়ে অনেককে তো দিনে একাধিকবার পর্যন্ত সেভ করতে দেখা যায়। যেন যত সেভ, তত উন্নতি। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে বলেছেন, গোঁফ ছোট করো, সেখানে চলে বাহারী গোঁফের প্রতিযোগিতা, প্রলম্বিত গোঁফ ঠোঁটকে ঢেকে ফেললে তবেই না জাতে উঠা গেলো। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন।

প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী! আমাদের সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। নশ্বর এ

৮. মুসলিম শরীফ

পৃথিবীতে কেউ চিরদিন থাকবে না। মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম আমাদেরকে মুখোমুখি হতে হবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। একবার ভেবে দেখুন তো, যাঁর সুপারিশের আশায় বুক বেঁধে বসে আছি, সুন্নত বিরোধী মুখখানা নিয়ে যখন তাঁর মুখোমুখি হবো, তিনি যদি তখন মুখ ফিরিয়ে নেন, তখন কী দশা হবে বলুন? যেখানে কথা ছিলো, আমরা আমাদের নবীর আদর্শ নিয়ে গর্ব করবো, সেখানে আজ আমরা নবীর আদর্শকে হত্যা করে গর্ব করছি ফ্যাশন নিয়ে। নবীজীর সুন্নতকে উপেক্ষা করে বুকে তুলে নিয়েছি পাশ্চাত্যের অভিশপ্ত ফ্যাশনকে। এটা নবীর বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহ নয় কি?

একটি হাদীস শুনুন।

একদা দাড়িবিহীন দু'ব্যক্তি সম্রাট কিসরার পক্ষ থেকে দূত হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আগমন করলে তিনি এতটা বিরক্ত হন যে, তাদের প্রতি মুখ তুলে তাকাতেও রাজি হননি। উপরন্তু তাদেরকে শাসিয়ে বললেন, তোমাদের ধ্বংস হোক, এই আকৃতি ধারণ করতে তোমাদেরকে কে বলেছে? তারা বললো, আমাদের প্রভু (সম্রাট কিসরা) বলেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিন্তু আমার প্রভু আমাকে আদেশ দিয়েছেন দাড়ি বড় করতে আর গোঁফ কেটে ছোট করে রাখতে।

উপস্থিত ভাই ও বোনেরা! লক্ষ্য করে দেখুন, দোজাহানের বাদশাহ কতটা দরদ মিশ্রিত তাগিদের সাথে বলেছেন, আমার প্রভু আমাকে দাড়ি লম্বা করে রাখতে বলেছেন আর গোঁফ রাখতে বলেছেন ছোট করে।

হযরত রাসূলে কারীম (রা.) এর এসব স্পষ্ট বাণী শোনার পর উচিত ছিলো, প্রত্যেক মুসলমান দাড়ি রাখবে, গোঁফ ছোট করবে এবং এই ভেবে মহান প্রভুর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে যে, তিনি আমাদেরকে আমাদের প্রিয় নবীর সুন্নতের উপর আমল করার তাওফীক দান করেছেন। একজন মুমিনের জন্য দাড়ি কামানোর কথা চিন্তা করাও ছিলো কল্পনাতীত। কারণ, যে ব্যক্তি মুমিন মুসলমান, সে তার নবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অবতীর্ণ হবে এ আবার কেমন কথা। মুমিন তো সে, যে তার নবীর একটি সুন্নত ও আদর্শের জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না, বরং অহংকারবোধ করবে। কিন্তু আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় হলো, ফ্যাশনের নেশা আমাদের বিবেক বুদ্ধি ও চিন্তা

চরিত্রকে গুলিয়ে ফেলেছে, বিকল করে ফেলেছে। ফলে আমরা সুস্থ চিন্তা ও যথার্থ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছি।

প্রিয় তাওহীদি জনতা! দাড়ি রেখেছেন সর্বকালের সকল আল্লাহপ্রিয় তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, মুহাদ্দিসীন ও আউলিয়ায়ে কেরাম। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, আজকের মুসলমানগণ সরাসরি দাড়ি মুণ্ডন করে আবার এই অন্যায় কর্মের প্রচার করে বেড়ায়। তারা এই অন্যায় কর্মকে প্রশংসা করে আর দাড়ি রাখাকে নিন্দা ও তিরস্কার করে। যুবক তো যুবক, অনেক বৃদ্ধ পর্যন্ত দাড়ি কামিয়ে খোলামেলা রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। অথচ দাড়ি ইসলামের একটি মহান বৈশিষ্ট্য, পৌরুষের প্রতীক, মুসলমানের ঐতিহ্যময় স্মারক। দাড়ি মর্যাদার স্বাক্ষী, সম্মান ও বুযুর্গীর নিদর্শন। দাড়ি পুরুষের সৌন্দর্য। দাড়িই পৌরুষের দীপ্ত প্রমাণ।

এক হাদীসে রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফেরেশতাদের একটি দল এই বলে তাসবীহ পাঠ করে যে, পূত পবিত্র সেই সত্তা, যিনি পুরুষ জাতিকে দাড়ি দ্বারা সৌন্দর্য মন্ডিত করেছেন আর নারীদেরকে সুসজ্জিত করেছেন বেণী ও খোপা দ্বারা।[৯]

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, পুরুষের জন্য সৌন্দর্যের বিষয় দাড়ি আর নারীদের জন্য সৌন্দর্যের বিষয় দীর্ঘ কেশ ও খোপা। এজন্যেই নবীজি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে দাড়ি রেখেছেন এবং উম্মতকে দাড়ি রাখতে উৎসাহিত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে ভারতের হায়দারাবাদ আনওয়ারুল উলূম কলেজের লেকচারার প্রফেসর হাসান সাঈদের একটি ঘটনা মনে পড়লো, শুনবেন কি আপনারা সেই ঘটনা।

উপস্থিত জনতা সমস্বরে বললো, অবশ্যই, অবশ্যই।

মাওলানা বলতে লাগলেন- প্রফেসর সাহেব বলেন, আমার এক বন্ধু। লোকটার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। দীর্ঘ দিন পর এক অনুষ্ঠানে দেখা। হজ করেছেন। কর্ম জীবনে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। মোটা অংকের পেনশন সহ অবসর নিয়েছেন। মুখে দাড়ি দাড়ি ভাব। মনে হয় সপ্তাহ খানেক ধরে কাটাকাটিটা ছেড়েছেন। দেখা হতেই সালাম দিলাম। উচ্চ কণ্ঠে জবাব দিলেন। উষ্ণ করমর্দনে অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু আমার মুখে এক মুষ্ঠি দাড়ি দেখে যেন কিছুটা বিব্রতও হলেন।

৯. বাহরুর রায়েক

বললেন, এদিকে এসো, একটা কথা বলবো। বললাম, বলুন। বললেন, মিয়া! নিজের বয়সের প্রতি তো দেখবা। এই বয়সে এতো লম্বা দাড়ি! আমি বললাম, এক মুষ্টি রাখা তো ওয়াজিব। বললেন, সময় ও পরিবেশের দিকে তাকাবে না? আর মানুষই বা কী বলবে? যাও, দাড়ি ছোট করো।

কী বিস্ময়ের ধর্মদ্রোহী উপদেশ! আমার ভারী কষ্ট হলো তার কথা শুনে। আরও কষ্ট হলো এ কারণে যে, জীবনের সন্ধ্যাবেলায় উপনীত একজন শিক্ষিত মুসলমান নিজ ধর্ম সম্পর্কে এতটা অজ্ঞ? না জেনে, না বুঝে মন মতো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করছে পবিত্র ইসলামের, ইসলামী বিধি বিধানের। অথচ উচিত ছিলো, মুসলমান হিসাবে আমাকে উৎসাহিত করা, ধর্মহীন ফ্যাশনতপ্ত এই পতন যুগে সুন্নতের প্রতি আমার এ অনুরাগ দেখে খুশি হওয়া। মনে মনে ভাবা, আমাকেও তো সুন্নতের রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে উঠা উচিত। অথচ করলেন তার বিপরীতটা।

উপস্থিত বন্ধুগণ! দাড়ি সম্পর্কে আর দুটি কথা বলেই আমি আমার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবো। আসলে দাড়ি রাখার ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এ ব্যাপারে একটু বিস্তারিত আলোচনা করলাম।

বেরাদারানে ইসলাম! অনেকে আছেন, কদম ফুল কিংবা ষ্টেডিয়ামের কাটা ঘাসের মতো করে থুতনীর নীচে সামান্য একটু দাড়ি রেখে চেহারার অবশিষ্ট সকল দাড়ি মুন্ডন করে ফেলেন। জানি না, এতে মজা লাগার মতো এমন কি আছে। হয়তো সমাজের মানুষ এটাকেও দাড়ি বলবে। কিন্তু ইসলামি আইনে এটা দাড়ি নয়। আধুনিক পরিভাষায় যাকে ফ্রান্সকাট দাড়ি বলে সুন্নত দাড়ির সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

আরেকটি কথা হলো অনেকে দাড়ি নিয়ে ঠাট্টা মশকারী করে। অথচ দাড়ি নিয়ে হাসি তামাশা করা, ঠাট্টা বিদ্রুপ করা কুফরি। কারণ, এতে সমস্ত নবী রাসূলকে ঠাট্টা করা হয়। অপমান করা হয় ইসলামের একটি স্পষ্ট বিধানকে। অধিকন্তু এই ঠাট্টা-বিদ্রুপের মাধ্যমে সকল সাহাবা, তাবেইন, ওলামা, আউলিয়া সকলকেই নির্বোধ ও বোকা সাব্যস্ত করা হয়। নাউযুবিল্লাহ।

দাড়ি ও গোঁফ সম্পর্কে আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে উপস্থিত জনতার কাছে আমি এ আবেদনই করতে চাই, আমরা কি আমাদের হৃদয় বিশ্বাসের বাদশাহ হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবো, নাকি আমেরিকা ও ইউরোপের অনুসরণ করবো?

এমন সময় লক্ষ জনাতার কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এলো, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবো। ইউরোপ-আমেরিকার বস্তা পচা ফ্যাশনকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবো।

[ষোল]

বাসের মধ্যে মাসুমের অমায়িক ভদ্রসূলভ আচরণে রায়হান সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলো। হুজুর মাওলানাদের সাথে মোটেও তার উঠাবসা না থাকায় তারা যে এতটা সুন্দর ও মার্জিত ব্যবহার জানে, এতো তাড়াতাড়ি যে তারা মানুষের হৃদয়ে আসন গেড়ে বসতে পারে এ কথা রায়হানের পূর্বে জানা ছিলো না। সে জানতো, হুজুর মানেই নোংরা, অভদ্র, অপরিচ্ছন্ন। হুজুর মানেই সেকেলে ধাচের কিছু লোক যারা দুনিয়া ও এর উত্থান পতন সম্পর্কে কোনো খবর রাখে না। কিন্তু সেদিন মাসুমের সাথে কিছুক্ষণের মুলাকাতে তার সেই ভুল ভাঙ্গলো। সে বুঝতে পারলো, আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। দুনিয়া সম্পর্কেও তাদের যথেষ্ট জ্ঞান আছে। সৌজন্যবোধ ও শিষ্টাচারিতার ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে কোনো কমতি নেই। মোটকথা বিভিন্ন কারণে মাসুমসহ সকল হুজুর মাওলানাদের প্রতি তখনই রায়হানের হৃদয়ের অঙ্কুরিত হয়েছিল এক পরম শ্রদ্ধাবোধ। সেজন্যই বাস থেকে নেমে বিদায় নেওয়ার সময় রায়হান বলে ছিলো, ভাইজান! আমি কয়েক মাসের মধ্যেই আপনার সাথে সাক্ষাত করবো। আর তখনই মাসুম খুশি হয়ে ভিজিটিং কার্ডটি এগিয়ে দিয়েছিলো তার দিকে।

[সতের]

রায়হান স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে। এরা তিন ভাই এক বোন। রায়হান সবার বড়। বিয়ের বয়স হয়ে যাওয়ায় গত কয়েকমাস পূর্বে বোনটিকে বিয়ে

দিয়েছে। পিতা কাস্টমস অফিসার। ভাল পয়সা বেতন পান। এতে সংসার চলিয়েও বেশ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। কিছুদিন পূর্বে রায়হানের আম্মা হঠাৎ করে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখানো হয়েছে। কিন্তু ফলাফল তেমন কিছুই হয়নি। দুদিন ভাল, দুদিন খারাপ; এভাবেই চলছে মায়ের অবস্থা। রায়হান মাকে নিয়ে বেশ পেরেশান। বগুড়ার ডাক্তার দ্বারা আশানুরূপ ফল না হওয়ায় মাকে ঢাকায় নিয়ে আসে। সেখানে পনের ষোল দিন চিকিৎসার পর রোগী পূর্ণ সুস্থ হয়।

রায়হানের আম্মা সুস্থ হওয়ার দুদিন আগে তার আব্বা ছুটি নিয়ে ঢাকায় আসেন। অবশ্য এর আগেও তিনি কয়েকবার ঢাকায় এসেছেন। সবাইকে নিয়ে বাড়িতে ফিরার সময় রায়হান ভাবলো, অনেক দিন যাবত মাসুম ভাইয়ের সঙ্গে দেখা নেই। বগুড়া থেকে বি.বাড়ীয়া যাওয়াও অনেক সময়ের ব্যাপার। এখন ঢাকায় আছি। আব্বা আম্মাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে একটু বি.বাড়ীয়া থেকে ঘুরে এলেও মন্দ হয় না। তাছাড়া সেদিন আব্বার কাছে শুনলাম, আসআদ নামে আমার এক দূর সম্পর্কের চাচাত ভাই বি.বাড়ীয়া কলেজে পড়াশুনা করে। কলেজের হোস্টেলেই নাকি থাকে। তাকে খুঁজে পেলে তো সোনায় সোহাগা হবে।

যেই ভাবনা সেই কাজ। রায়হান তার ছোট ভাই সহ আব্বা আম্মাকে একটি মাইক্রোতে উঠিয়ে দিয়ে সেদিনই মহানগর ট্রেনে চড়ে বি.বাড়ীয়া কলেজ হোস্টেলে চলে আসে। তারপর অনেক খোঁজাখুঁজি করে আসআদকে বের করে। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর আসআদের সীটেই রায়হান ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন ছিল শুক্রবার। রায়হান রাতেই মাসুম সম্পর্কে আসআদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলো। সেই সঙ্গে মাসুমের ভিজিটিং কার্ডটিও তাকে দেখিয়েছিলো। তখন আসআদ বলেছিলো- ঠিক আছে, আগামী কাল জুমআর নামাজের পর খাওয়া দাওয়া সেরে তোমাকে তাদের বাসায় নিয়ে যাবো। আশা করি তাকে খুঁজে পেতে আমাদের বেশি একটা বেগ পেতে হবে না।

আসআদ রায়হানকে নিয়ে শহরের জামে মসজিদে নামাজ পড়তে গেলো। মাসুম ছিলো এই মসজিদেরই ইমাম ও খতীব। মাসুম যখন বয়ানের জন্য মিম্বরে বসলো তখন রায়হান বললো, ভাই আসআদ! তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। মিম্বরে উপবিষ্ট ইমাম সাহেবই আমার কাঙ্খিত ব্যক্তি।

নামাজের পর মাসুম রায়হানকে দেখে বুকে জড়িয়ে মোয়ানাকা করলো। বাড়ি ঘরের সবার অবস্থা ও কুশলাদি জিজ্ঞেস করলো। তারপর রায়হান ও আসআদকে নিয়ে বাসায় পৌঁছল।

খানা পিনার পর রায়হান ও আসআদ মাসুমের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলো। রায়হান বসেছিলো জানালার দিকে মুখ করে। এখান থেকে বাইরের সবকিছু দেখা যায়। জানালার পাশে ছিলো বাড়িতে প্রবেশের মূল রাস্তা। একটু পর বোরকা পরিহিতা অনেক মেয়ে যখন মাসুমদের বাড়িতে ঢুকল, তখন রায়হানের কৌতূহল জাগলো। তার জানতে ইচ্ছে হলো- এত অধিক সংখ্যক মেয়ে বাসায় ঢুকছে কেন? তাই এক সময় মাসুমকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেই বসলো। মাসুম বললো- প্রতি শুক্রবার আমাদের বাসায় মেয়েদের ইজতেমা হয়। এ উপলক্ষেই এলাকার মেয়েরা এখন ভিতরে যাচ্ছে।

ঃ ইজতেমা পরিচালনা করে কে? রায়হান বললো।

ঃ তোমার ভাবীই বয়ান করে, তালীম করে শোনায়।

ঃ তিনি কি মাদরাসায় পড়াশুনা করেছেন।

ঃ হ্যাঁ, সে ঢাকার একটি মহিলা মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেছে।

নাজিয়ার তালীমের বরকতে এলাকার অনেক যুবতী মেয়ে বোরকা পরতে শুরু করেছে। নাজনীন এবং ফারহানাও এই বরকত থেকে মাহরুম হয় নি। গত কয়েক মাস থেকে তারাও বোরকা পরা ও পর্দা মতো চলা শুরু করে দিয়েছে।

ফারহানা, নাজনীন ও আতিকা বেগম প্রতি শুক্রবারেই সবার আগে ইজতেমায় চলে আসে। কেননা তারা এখন কেবল শ্রোতা হিসেবেই আসেনা, ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েও আসে। অর্থাৎ একটু আগে-ভাগে এসে তারাই ইজতেমার যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেয়। চাটাই বিছায়, নাজিয়ার বসার স্থান ঠিকঠাক করে, জগ দিয়ে ঠান্ডা পানি এনে রাখে ইত্যাদি।

সেদিন ইজতেমা শেষ হওয়ার পর নাজনীনরা সবকিছু গুছিয়ে সবার শেষে বের হচ্ছিলো। তারা যখন রায়হানদের বসা ঘরখানার জানালা বরাবর পৌঁছলো, ঠিক এমন সময় কিসের মধ্যে লেগে যেন নাজনীনের বোরকা আবৃত মুখখানা উম্মুক্ত হয়ে গেলো। নাজনীন লজ্জায় মরিয়া হয়ে তখনই মুখ

ঢেকে নিলো। কিন্তু রায়হানের মণিকোঠায় বন্দী হয়ে গেলো একটি ফুটন্ত লাল গোলাপ।

সেদিন রাতে মাসুমের অনুরোধে রায়হানের সাথে আসআদকেও মেহমান হতে হলো। মাসুম কিছুতেই তাকে ছাড়লো না। আসআদ হোস্টেলে চলে যাওয়ার জন্য কতো করে বললো, কিন্তু কোনোই কাজ হলো না। অবশেষে রায়হানের পাশের সীটেই আসআদের থাকার জায়গা নির্ধারিত হলো।

রাত তখন দশটা। রায়হান ও আসআদ নিজ নিজ সীটে শুয়ে পড়েছে। কিন্তু শয্যায় শয়ন করেও দু'চোখের পাতা এক করতে পারলো না রায়হান। তার হৃদয় দর্পণে কেবলই নাজনীনের সুন্দর মুখখানা ভেসে উঠলো। অবশেষে কোন কিছু ভালো না লাগায় অস্থির হয়ে কক্ষময় পায়চারী করতে লাগলো।

আসআদ প্রতিদিন পড়াশুনা শেষে বারটা একটার দিকে ঘুমুতে যায়। কিন্তু আজ নিয়মের বিপরীত দু তিন ঘন্টা আগেই শয্যাশায়ী হওয়ায় তার চোখেও ঘুম এলো না। সুতরাং রায়হান ঘরময় পায়চারী শুরু করলে আসআদ জিজ্ঞেস করলো-

ঃ রায়হান! কি হলো তোমার? এমন করছো কেন?

ঃ না, এমনিই। ঘুম আসছে না তাই হাঁটাহাঁটি করছি।

আসআদ বাতি জ্বালিয়ে দিলো। দেখলো, রায়হানের চেহারায় অস্থির ভাব। মনে হলো, কি যেন হারিয়ে ফেলেছে সে। আসআদ আবার বললো-

ঃ ভাই! আমার নিকট কিছুই গোপন করো না। সত্যি করে বল তো কি হয়েছে?

ঃ কই! কিছুই হয় নি তো আমার।

ঃ নিশ্চয়ই হয়েছে। দুনিয়ার সবাইকে ফাঁকি দিতে পারলেও আমাকে পারবে না। সুতরাং গড়িমসি না করে সবকিছু খুলে বলো। আর মনে রেখো, আমাকে সর্বদা তুমি একজন সাহায্যকারী হিসেবেই পাবে।

এবার রায়হানের কিছুটা সাহস হলো। তারপরও সে কথাটি বলবে কি বলবে না এ নিয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগলো।

আসআদ বললো- রায়হান তুমি নির্দ্বিধায় আমার নিকট মনের কথা বলতে পারো। এতে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই তোমার।

রায়হান বললো, ভাই আসআদ! আজ দুপুরে খানাপিনার পর আমরা যখন ঘরে বসা ছিলাম তখন বোরকাবৃতা একটি মেয়ের মুখ উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিলো। এ মেয়েটিকে তুমি জানো কি?

ঃ হ্যাঁ জানি। সে তো আমাদের কলেজেই ২য় বর্ষে পড়াশুনা করে। মেয়েটির নাম নাজনীন। তার পিতার নাম হাশেম খান। বাসা মধ্যপাড়ায়।

ঃ তুমি কি তাদের বাসা চিনো?

ঃ চিনি। কেনো? ভাল লাগলো নাকি?

ঃ শুধু ভাল লাগে নি, ভালোবেসেও ফেলেছি।

ঃ একটুতেই ভালোবেসে ফেলেছো?

ঃ হ্যাঁ, কি করবো ভাই! অন্তরতো আমার অধীন নয়। ওকে কিছুতেই মানাতে পারছি না। নাজনীনের ভালোবাসার আগুনে আমি অহর্নিশ জ্বলছি। প্রেমানল আমার শিরা উপশিরাগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এ আগুন থেকে তুমিই আমায় উদ্ধার করো ভাই।

ঃ আচ্ছা ঠিক আছে। অস্থির হওয়ার প্রয়োজন নেই। এখন ঘুমিয়ে পড়ো। এ ব্যাপারে কি করা যায় আমি দেখবো।

রায়হানের ইচ্ছা ছিলো শনিবারে বাড়ি চলে যাবে। কিন্তু নাজনীনের পূর্ণ খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য আরও দুদিন থেকে সোমবারে সে বাসায় ফিরলো।

[আঠার]

বাড়িতে যাওয়ার পর রায়হান নাজনীনের নিকট পরপর কয়েকটি চিঠি দিলো। কিন্তু একটিরও উত্তর পেলো না। সে ভাবলো, তবে কি নাজনীনের হাতে চিঠি পৌঁছে নি?

রায়হান যখন মাসুমদের বাড়িতে ছিলো তখন নাজিয়ার মাধ্যমে নাজনীনও তার পরিচয় পেয়েছিলো। এমনকি চুপি চুপি রায়হানের উজ্জ্বল দীপ্ত মুখ মন্ডল ও বলিষ্ঠ গঠন দেখে তার মনেও এক প্রকার আনন্দ শিহরণ জেগেছিলো।

রায়হানের চিঠি পেয়ে নাজনীন রায়হানের প্রতি আরও দুর্বল হয়ে পড়লো। এক পর্যায়ে চিঠির উত্তর দেওয়ার জন্যও তৈরি হলো। কিন্তু ফারহানার সেই ভয়ংকর ঘটনা মনে হতেই উত্তর লেখা থেকে বিরত রইল। মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলো, ভাগ্যে যা আছে তাই জুটবে। জীবন গেলেও বিবাহপূর্ব প্রেমে জড়িয়ে পড়বো না।

একদিন নাজনীন রায়হানের দেয়া চিঠিগুলো ফারহানাকে দেখায়। সেই সাথে নিজের প্রতিজ্ঞার কথাও জানায়। চিঠি পড়ে এবং নাজনীনের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে ফারহানা বললো- বোন! তুই ঠিক কাজটিই করেছিস। তোর পায়ে ধরে বলি, এ ভয়ংকর পথে কখনো পা বাড়াবি না। এতে দ্বীন দুনিয়া সবই নষ্ট হবে। লেখাপড়া গোল্লায় যাবে। যার বাস্তব প্রমাণ আমি নিজে।

নাজনীন বলল, তাহলে আমি এখন কী করবো তু-ই বলে দে।

ফারহানা বললো- চিঠির উত্তর দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। তবেই তিনি মনে করবেন তোর হাতে চিঠি পৌঁছে নি। আর মনে রাখবি, তোর সাথে রায়হান ভাইয়ের জোড়া লিখা থাকলে একদিন না একদিন তাকে তুই পাবেই।

ঠিক আছে। তাই হবে বলে নাজনীন ফারহানার কাছ থেকে বিদায় নেয়।

নাজনীন তার প্রতিজ্ঞা ঠিক রাখতে পারলো না। রায়হানের যাদুময় কথা তাকে চিঠির উত্তর দিতে বাধ্য করলো। সে রায়হানের নিকট একটি জবাবী চিঠি পাঠালো।

এদিকে বেচারা রায়হান একটি ব্যতীত অন্য কোন চিঠির উত্তর না পেয়ে হতাশ হয়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত মনটাকে কোনো রকম বুঝিয়ে সুঝিয়ে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করার চেষ্টা করলো।

[উনিশ]

গত কিছুদিন পূর্বে রায়হানের ইন্টারমিডিয়েট ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। পরীক্ষার পর এদিক সেদিক ঘোরাফেরা না করে সময়টাকে কাজে লাগানোর জন্য রায়হান এক চিল্লা অর্থাৎ ৪০ দিনের জন্য তাবলীগ জামাতে বের হয়ে গেছে। তাদের জামাতে মোট ১৫ জন সাথী। তম্মধ্যে সাতজন একই জেলার বিভিন্ন এলাকার ছাত্র। বাকিদের মধ্যে সাতজন পুরোনো সাথী ও একজন আলেম। ঢাকা কাকরাইল মসজিদ থেকে জামাত বন্দী করে

এদেরকে বি.বাড়ীয়া পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজ সংলগ্ন একটি মসজিদে অবস্থান করছে। সম্মেলনের শেষ দিন এলাকার লোকদের মুখে নদভী সাহেবের বয়ানের সুনাম শুনে আমীর সাহেবের অনুমতি নিয়ে রায়হানও তার সাথীদের নিয়ে মাঠে উপস্থিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বয়ান শুনে এরা সবাই পাক্কা ইরাদা করেছে জীবনে আর কোনোদিন দাড়িতে হাত দিবে না। রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী জীবন যাপন করবে। নিজের পরিবার ও সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে সুন্নত কায়েম করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে।

[বিশ]

দাড়ি সম্পর্কে আলোচনা শেষ হওয়ার পর মাসুম একটি কাগজ পাঠালো। তাতে লেখা ছিলো- হুজুর! অনুগ্রহ পূর্বক ফ্যাশনের আরও কিছু উদাহরণ দিলে ভাল হয়। যাতে করে এই সর্বনাশা ব্যাধি থেকে আমরা সবাই বাঁচতে পারি।

জবাবে নদভী সাহেব বললেন, হ্যাঁ, আপনার আবেদন অবশ্যই রাখবো। তবে এর আগে আমি এমন কিছু লোকের হাত দেখতে চাই যারা এ মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করবে যে, এখন নদভী হুজুর যেসব বিষয়কে ফ্যাশন ও সুন্নতের পরিপন্থি কাজ বলে চিহ্নিত করবেন, আমরা জীবন দিয়ে হলেও তা থেকে বিরত থাকবো, সেই সঙ্গে সুন্নত ও ইসলামী বিধি বিধান পুরোপুরী মানার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

নদভী সাহেবের কথা শেষ হওয়ার আগেই সমবেত লোকজন হাত উঠালো। এমন কি পর্দার অন্তরালের মহিলারাও। ফারহানা এবং নাজনীন তো আবেগের আতিশয্যে বসা থেকে দাঁড়িয়ে দুই হাত উঁচু করলো। তাদের এ আবেগ দেখে নাজিয়া মনে মনে বেশ খুশি হলো।

মাওলানা সাহেব বললেন- আলহামদুলিল্লাহ। ফ্যাশনের কবর রচনা করে সুন্নত মোতাবেক জীবন পরিচালনা করার জন্য আপনাদের আগ্রহ দেখে সত্যিই আমি অভিভূত হয়েছি। দুআ করি, আল্লাহ পাক আমাদের ইচ্ছা ও ইরাদাকে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দিন।

www.smfoundationbd.com

আমি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে নম্বর দিয়ে প্রচলিত ফ্যাশনগুলো উল্লেখ করবো। সেই সাথে সুন্নত ও ইসলামী বিধান কি তাও বলে দেব। যাতে করে মনে রাখা ও আমল করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়।

১. বসে প্রস্রাব করা সুন্নত। আর দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জাত ফ্যাশন। প্রস্রাবের ফোঁটায় কাপড় চোপড় মাখামাখি করে তোলা ফ্যাশনের নগদ উপহার।

২. রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো চুল রাখা সুন্নত। আর আধুনিক নানা ষ্টাইলে চুল রাখা ফ্যাশন।

বর্তমানে চুলের ফ্যাশনে প্রতিদিনই নতুন নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। যোগ হচ্ছে নতুন নতুন নাম। মনে হয় চুলের রাজ্যে ফ্যাশনের তাড়া খেয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটছে তরুণের দল। তারা স্থির করে বলতে পারছে না কেমন চুল, কেমন স্টাইল তাদের কাম্য কিংবা পছন্দ।

এ প্রসঙ্গে প্রফেসর হাসান সাঈদের আরেকটি ঘটনা মনে পড়লো। তিনি বলেন- হায়দারাবাদের বিখ্যাত উইমেন্স কলেজের কাছে একটি কার এসে থামলো। গাড়ি থামতেই উহা থেকে শর্টকার্ট দামী পোষাক পরিহিতা এক তরুণী অবতরণ করলো। কাছেই দাঁড়ানো ছিল দুই উঠতি বয়সের তরুণ। তারা দীর্ঘবেশী এই তরুণীকে দেখে অর্থবহ ভঙ্গিতে সহাস্য দৃষ্টিতে বিশেষ ষ্টাইলে সিটি বাজাতে লাগলো। উদ্দেশ্য হলো, তরুণী তাদের দিকে তাকালে তাদের তৃষিত দৃষ্টি পরিতৃপ্ত হবে।

কিন্তু সেই তরুণী যখন মুখ ঘুরিয়ে তাদের মুখোমুখি দাঁড়ালো, তখন তো তারা লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলো। কারণ এই আগত অচেনা অতিথি কোন তরুণী নয় বরং সে একজন সামর্থবান যুবক।

৩. বসে দস্তর বিছিয়ে খানা খাওয়া সুন্নত। আর চেয়ারে বসে বিশাল আকারের ডাইনিং টেবিল সামনে নিয়ে খাওয়া ফ্যাশন। দাঁড়িয়ে খাবে তো আরো ভালো। ওটা বরং দু'তলা ফ্যাশন। কোনো কোনো পার্টি-অনুষ্ঠানে আয়োজনটাই এমনভাবে করা হয় যাতে বসে খাওয়ার কোনো ব্যবস্থাই থাকে না। ওই সব স্থানে নিজেকে ষ্টান্ডার্ড প্রমাণ করতে হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানাহার করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই।

৪. খানা-পিনার পর হাত চেটে খাওয়া সুন্নত। আর এই সুন্নতের প্রতি

চোখ বাকিয়ে রসিকতা করা ও টিপ্পনী কাটা ফ্যাশন। (উল্লেখ্য যে, ছোট থেকে ছোট যে কোনো সুন্নত নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করলে ঈমান চলে যায়)

৫. বরতন পরিষ্কার করে খাওয়া সুন্নত। আর কিছু রেখে দেওয়া ফ্যাশন।

৬. মাথায় টুপি ব্যবহার করা সুন্নত। আর খালি মাথায় ঘোরা ফ্যাশন।

আমাদের সমাজে এমন অনেক মুসলমান আছেন, যাদের জন্য টুপি পরিধান করা খুবই কষ্টকর। কেউ কেউ মসজিদে নামাজ পরতে যাবার সময় টুপি পরেন। আবার কেউ কেউ আছে টুপি পকেটে করে মসজিদে যান। সেখানে গিয়ে তারপর টুপি মাথায় দেন। নামাজ শেষ হওয়ার পর মসজিদ থেকে বের হতেই প্রথম দায়িত্ব হিসেবে অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সাথে টুপিটা মাথা থেকে খুলে ভাজ করে পকেটে রেখে তারপর অন্য কাজ। যেন তার আশে পাশের কেউ তাকে টুপি পরা অবস্থায় না দেখে ফেলে। টুপি মাথায় দেখলে কী ভাববে মানুষ? এই ভয়েই যেন তটস্থ। কিন্তু একথা ঘূর্ণাক্ষরেও ভেবে দেখে না যে, আমার মাথায় সুন্নতের এই আলোকিত রূপ দেখে প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সীমাহীন খুশি হবেন।

৭. নখ কেটে ছোট রাখা ও মেয়েরা হাতে মেহেদী ব্যবহার করা সুন্নত। কিন্তু দীর্ঘ নখ রেখে তার উপর লাল গোলাপী নীল ইত্যাকার রঙ্গের নেইল পালিশ ব্যবহার করাও একটি অন্যতম ফ্যাশন। এই ফ্যাশনের টানে আমাদের নারীরা পশুর মতো লম্বা নখ রাখে। এতে পেইন্ট করে মনের আল্পনা আঁকে। এমনকি অনেক মেয়েলী স্বভাবের পুরুষও এই ফ্যাশনের শিকার। এ হলো আধুনিক সভ্যতার বীভৎস চিত্র।

তবে এর চাইতেও ভয়ংকর বিষয় হলো, নেইল পালিশ ব্যবহার করার ফলে নখে অজুর পানি পৌঁছায় না। তাই অজু গোসল কোনোটাই হয় না। ফলে এসব লোকদের নামাজও আদায় হয় না। অবশ্য এসব লোক নামাজের ধারও ধারে না। তবে এর দ্বারা তাদের ফায়দা (?) যা হয়, তা হলো, তারা নিজেরা নিজের হাতে বেনামাজীর সাইন বোর্ড লাগিয়ে ঘুরে ঘুরে বলে বেড়ায়- দেখুন, আমি কিন্তু বেনামাজি। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে!

৮. টাখনুর উপর কাপড় পরা সুন্নত, আর নীচ পর্যন্ত পরা ফ্যাশন।

৯. কথা বলার পূর্বে আসসালামু আলাইকুম বলা সুন্নত। আর হ্যালো

বলা ফ্যাশন।

আমরা যদি একটু চিন্তা করি, তাহলে দেখবো প্রেম, মমতা, হৃদ্যতা ও সম্মান প্রকাশের জন্য সালামের চাইতে উত্তম কোনো বাক্য হতে পারে না। এটি একটি অত্যন্ত সারগর্ভ দুআ। এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাক আপনাকে সর্বপ্রকার অনিষ্ঠ ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন। একই সাথে এটি ছোটদের প্রতি মমতা ও স্নেহসিক্ত দুআ এবং বড়দের প্রতি পরম সম্মান ও তাযীমপূর্ণ শুভ কামনা।

১০. কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় সালাম দেয়া সুন্নত। আর টাটা, বাই বাই, ইত্যাদি বলা ফ্যাশন।

আমাদের সমাজের আধুনিক শ্রেণীর লোকেরা কারো বিদায়ের সময় নিজেদের শিশু সন্তানদেরকে হাসি হাসি মুখে হাত নেড়ে নেড়ে টা টা, বাই বাই বলতে থাকে। অথচ কর্তব্য ছিলো মা-বাবা তাদের আদরের সন্তানদেরকে আসসালামু আলাইকুম, শেখাবেন। কিন্তু শেখাচ্ছেন টা টা, বাই বাই। এতে আমাদের পূর্ণ জীবনটাই হয়ে যাচ্ছে টা টা, বাই বাই আর হ্যালো- হাই কেন্দ্রিক।

১১. ভোরে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ফজর নামাজ আদায় করা প্রতিটি সাবালক মুসলমানের উপর ফরজ। পক্ষান্তরে সকাল ৮টা-৯টায় ঘুম থেকে উঠা ফ্যাশন। তার উপর বাসি মুখে বেড টি পান করা ডাবল ফ্যাশন। ওই নোংরামীর মধ্যেই যত স্বাদ ও তৃপ্তি।

১২. ধর্মীয় বই-পুস্তক পড়া এবং দীনি ইলম অর্জন করা প্রতিটি মুসলমানেরই কর্তব্য। কিন্তু ফ্যাশন বলে ওসব নয়, আধুনিক প্রগতিবাদীদের লেখা গল্প উপন্যাস পড়ো, সিনেমা পত্রিকা ও পর্ণো - ম্যাগাজিন পড়ো আর ধর্মকে সেকেলে বলে গালি দাও। তবেই না ফ্যাশনটা ষোলকলায় পূর্ণ হলো।

১৩. পুরুষের জন্য স্বর্ণ হারাম। কিন্তু ফ্যাশন রক্ষা করতে হলে গলায় স্বর্ণের চেইন, হাতে ব্র্যাসলেট আর আঙ্গুলে আংটি তো পরতেই হয়।

১৪. ডান হাতে পানাহার করা সুন্নত আর বাম হাতে করা ফ্যাশন।

১৫. রাতে শোবার সময় সূরা ফালাক, নাস, তাসবীহ ফাতেমী, আয়াতুল কুরসী এবং মাসনুন দুআ আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া পড়া সুন্নত। আর ফ্যাশন বলে দেশী বিদেশী কোনো গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে

যাও। তাতেও মন না ভরলে একখানা চরিত্র বিধ্বংসী উপন্যাস কিংবা সেক্সভিত্তিক ম্যাগাজিন নাও। এরপর ওই নোংরামীর আবর্তে হাবুডুবু খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়।

১৬. মসজিদে মুসল্লীদের নূরানী মাহফিলে বিয়ে হওয়া সুন্নত। আর আজকাল বিয়ের জন্য চাই কমিউনিটি সেন্টার, মসজিদের সাথে যার তুলনা হয় কেবল বিপরীত শব্দ হিসেবে।

১৭. কুরআন হাদীস পাঠ করতে হয় ইসলামকে জানার জন্য, বুযুর্গ-মনীষী, ওলামা-মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের তাযীম করতে শিখার জন্য। কিন্তু আজকাল কুরআন হাদীসের সামান্য অনুবাদ পাঠ করে আর দু'চারটি ইতিহাসের পুস্তক পড়ে ইসলাম ও আলেম-ওলামাদের সমালোচনা করা একটা বেশ চমৎকার ফ্যাশন। যত্রতত্র এর অনুশীলন লক্ষ্য করা যায়।

১৮. পর্দা করা ফরজ। পক্ষান্তরে আধুনিক ফ্যাশনের অনিবার্য দাবি হলো, পর্দাহীনভাবে নারীকে স্কুল, কলেজ, মার্কেটে রূপ প্রদর্শন করে বেড়াতে হবে। যেন এই মহান (?) কাজের জন্যই নারীর সৃষ্টি ও জন্ম।

১৯. ইসলাম নারীর জন্য এমন পোশাক চায়, যার দ্বারা তার পূর্ণ শরীর আবৃত থাকবে। আর ফ্যাশন দিয়েছে এমন বিপরীত মুখী পোষাক, যার দ্বারা পেট পিঠসহ শরীরের রমণীয় প্রতিটি অঙ্গই যেন কড়কড়া হয়ে উঠে।

২০. মেয়েদের জন্য মোটা কাপড় পরিধান করা সুন্নত আর ফিনফিনে পাতলা পোশাক পরিধান করা ফ্যাশন।

আমাদের সমাজের অনেক নারী এতটা পাতলা পোশাক পরিধান করে যে, বাইরে থেকে পূর্ণ শরীর দেখা যায়। শরীরের ঝলকিত রূপ হালকা আবরণের তুচ্ছ বাধা ঠেলে ঝলসিত করে তার চারপাশ। নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব নির্লজ্জ রমণীদের প্রতি লা'নত করেছেন।

২১. মাথায় কৃত্রিম আগলা চুল ব্যবহার করা শরিয়ত বিরোধী। অথচ এটাই ফ্যাশন।

২২. গাইরে মাহরাম অর্থ্যাৎ যাদের সাথে বিবাহ জায়েজ তাদের সামনে আসা, মুখোমুখি বসা, ফ্রি স্টাইলে চলাফেরা করা, গল্পগুজব করা ফ্যাশন আর ইসলামী বিধান এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

২৩. মদ হারাম। অথচ উচ্চতর ফ্যাশনের প্রাণই হলো এই মদ। সমাজের অতি উঁচু(?) শ্রেণীর মধ্যে নর-নারী উভয় শ্রেণীই মদ্যপ হয়। তাদের অতিথি শালায় দেশী-বিদেশী নানা রঙ বেরঙ-এর মদ সাজিয়ে রাখা হয়। শহরের নানা কেন্দ্রে আবার মদ্যশালাও থাকে। সেখানে সমাজের কথিত ওই উঁচু তলার লোকেরা দল বেধে সমবেত হয়। রাত ভর মদ পান করে দীন দুনিয়া ধ্বংস করার মহা উদ্যোগ মেতে উঠে। রমজানের পবিত্র প্রহরেও চলে এই নারকীয় তান্ডব। বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে নেশার হাতের পুতুল এই মদ্যপ নেশাখোররা।

২৪. কুরআন তিলাওয়াত ও শ্রবণ মহা কল্যাণ ও ছওয়াবের বিষয়। আর ফ্যাশন হলো গান শোনা, ব্যান্ড সংগীতের তালে তালে নৃত্য করা, ছায়াছন্দের প্রোগ্রাম দেখা ইত্যাদি। টিভি, ভিসিআর হারাম হলেও ফ্যাশনের জাত রক্ষার জন্য তা অবশ্যই ঘরে রাখা চাই।

২৫. বেঈমান কাফেরদের অনুকরণ হারাম। অথচ ফ্যাশনের প্রাণই তাদের অনুকরণ। তাদের পোষাক, তাদের কথা, তাদের কালচারের অনুসরণই ফ্যাশন।

২৬. নারীরা নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। আর অর্ধনগ্ন হয়ে অদ্ভুত রকমের হাই ছিল জুতো পরে টই টই করে ঘোরা-ফ্যাশন।

২৭. প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের সহাবস্থান যেমন অবৈধ তেমন সহশিক্ষাও সম্পূর্ণ হারাম। অথচ সহশিক্ষা ফ্যাশনের জন্মস্থান। যার আগুনে পুড়ে ছাই-ভস্ম হচ্ছে আমাদের সমাজ।

২৮. ইসলামী শরিয়তে পিতা মাতার কথামতো চলা ফরজ- অবশ্য কর্তব্য। অথচ ফ্যাশনবাদী ছেলেমেয়েরা সর্বদাই পিতা-মাতাকে এড়িয়ে চলে। সম্মান করার পরিবর্তে বোকা মনে করে। সেই সাথে পদে পদে দেয় কষ্ট ও জ্বালাতন।

২৯. ঘরে প্রাণীর ছবি রাখা, কুকুর রাখা, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ছবি তোলা জায়েজ নেই। অথচ প্রাণীর ছবি দেয়ালে না উঠলে ফ্যাশনের জাত রক্ষা হয় না।

আজকাল ঘরে-বাইরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বিয়ে শাদীতে, পিকনিকে এমনকি (আল্লাহ মাফ করুন) ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পর্যন্ত ছবি তোলা ও ভিডিও করা একটা ব্যাপকতর ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহানবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত মাহফিলেও এ জাতীয় পাপকর্মের মহড়া পরিলক্ষিত হয় অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে অনিবার্য প্রয়োজন যথা পাসপোর্ট ইত্যাদি ছাড়া ছবি তোলা সম্পূর্ণ হারাম ও না জায়েজ। হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যারা ছবি আঁকে তারা কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আজাব ভোগ করবে।[১০] অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ঘরে কুকুর কিংবা ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করে না।[১১]

যদি কেউ ছবি তোলা বা জীবের চিত্র ংকনকে জায়েজ মনে করতঃ তা করে তবে সে অবশ্যই কাফের হয়ে যাবে। কেননা সে হারামকে হালাল বলে বিশ্বাস করেছে।

ফ্যাশন সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে নির্ধারিত দেড় ঘন্টা সময়ের প্রায় এক ঘন্টা চলে গেল। এবার নাজিয়া পর্দার আড়াল থেকে লিখে পাঠালো- হুজুর! আজকের প্রশ্নোত্তর পর্বে যেহেতু ফ্যাশন সম্পর্কেই আলোচনা চলছে তাই আমার বিনীত আবেদন হলো, বাকি সময়টুকুতে ফ্যাশনের ক্ষয়ক্ষতি ও ফ্যাশন পূজার চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করে আলোচনার পূর্ণতা দান করা হোক।

হুজুর বললেন- ফ্যাশনের ক্ষয়ক্ষতির পরিপূর্ণ ফিরিস্তি তুলে ধরা তো মুশকিল। তবে বিষয়টি সরল করে তোলার জন্য এখানে কয়েকটি নমুনা তুলে ধরছি।

১. ফ্যাশনের অনুসরণ আমাদের জীবন থেকে সুন্নতকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। তবে এর চাইতেও ভয়ংকর ক্ষতি হলো, আলোর পরিবর্তে ডেকে আনা সেই অন্ধকারকে আমরা অন্ধকার মনে করছি না। আমরা বরং উল্টো অন্ধকারকেই আলো ভেবে তৃপ্ত হচ্ছি। পার্থিব এই ক্ষুদ্র জীবনের রঙ্গিন আলো আমাদের দৃষ্টি ও বিবেককে এতটা বাধাগ্রস্থ করছে যে, আমরা লাভ ক্ষতি, সফলতা-ব্যর্থতার হিসাব কষতে পারি না।

২. ফ্যাশনের আরেকটি বড় ক্ষতি হলো, এতে করে ইসলামী মন-মানসিকতা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়। এক সময় ইসলামী যে কোনো বিষয় তার কাছে অসুন্দর ও মন্দ ঠেকতে শুরু করে। ইসলামী নামের যে

১০. বুখারী ২ঃ৮৮০, মিশকাত ঃ ৩৮৫

১১. বুখারী ২ঃ৮৮০, মিশকাত ঃ ৩৮৫

কোনো বিষয়ই সেকেলে ও পুরানো মনে হয়, মনে হয় চরম পরিত্যাজ্য। ইসলামের শিক্ষা-সভ্যতা সংস্কৃতি বর্জন করার মধ্যেই মনে হয় জীবনের সকল স্বার্থকতা নিহিত।

৩. ফ্যাশন মানুষকে হারাম পথে আহবান করে। তা এভাবে যে, ফ্যাশনের জাত রক্ষা করতে ড্রয়িং রুম সাজানোর জন্য দেশী বিদেশী কার্পেট, সোফা, চিত্র আমদানী করা হয়। বিনা প্রয়োজনে ডজন ডজন শাড়ি, নানা রঙ, নানা ডিজাইন ও নানা প্রিন্টের কাপড় বহন করতে করতে আলমারীও ক্লান্ত হয়ে উঠে। কিন্তু ক্লান্ত হয় না ফ্যাশন প্রিয় নারী-পুরুষ ও তাদের শখ-স্বপ্ন। বিয়ে শাদীর নামে তো অর্থ বিনাশের বন্যা নামে। চতুর্দিকে চলে অপচয়ের মহড়া। আর এই অপচয়ের অর্থ যোগানোর জন্য হারাম উপার্জনের প্রতিযোগিতা চলে। সুদ ঘুষের গন্ধ পেলে দেহতন্ত্রের প্রতিটি শিরা যেন চাঙ্গা হয়ে উঠে। অনেক পাপী তো সুদে টাকা এনে ফ্যাশনের মুখ রক্ষা করে। হায়, কী যে বদনসীব এসব মানুষের!

এবার আমি ফ্যাশন পূজার চিকিৎসা সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করেই মোনাজাত করে দিবো।

ফ্যাশন পূজা একটি ভয়ংকর রোগ। এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিম্নের কাজগুলো গুরুত্বের সাথে আদায় করা প্রয়োজন।

১. যে কোনো দ্বীনি মাহফিলে অংশ গ্রহণ করতে হবে। অংশ গ্রহণ করবেন নিজে। সঙ্গে নিয়ে যাবেন সন্তান-সন্ততি ও বন্ধু-বান্ধবদেরকেও। প্রাথমিক পর্যায়ে হয়তো মন বসতে চাইবে না। তবুও যাবেন। মনোযোগ বাড়াতে সচেষ্ট হবেন। হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (র.) তার জাযাউল আমল গ্রন্থে লিখেছেন, পাপের কারণে সৎ লোকদের প্রতি এক রকমের ভয় ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তাদের কাছে বসতে মন চায় না। রীতিমতোই আমরা এ অবস্থার শিকার হই। এই সংকট থেকে উত্তরণে ধৈর্যের সাথে অগ্রসর হতে হবে। মন না চাইলেও এ জাতীয় দ্বীনি মাহফিলে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। ইসলামের নামে আহূত যে কোনো ওয়াজ-মাহফিলেই ছুটে যাবেন না। তার আগে দেখতে হবে এর আয়োজকরা হকপন্থি কি-না। আলোচকগণ হক্কানী আলেম কিনা? তারা কি সাহাবায়ে কেরাম ও সকল কালের বরেণ্য আল্লাহ ওয়ালাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল?

নাকি তারা দ্বীনের নামে মাহফিল পেতে নিজেদের গুণকীর্তন প্রচার করে বেড়ায়, আর অতীত কালের নবী সাহাবীদের প্রতি কুৎসা প্রচার করে বেড়ায়? তারা যে ইসলাম ও আমলের কথা বলেন, তার রঙ কি তাদের জীবনে পরিলক্ষিত হয়? না শুধুই মুখের শ্লোগান? এসব কিছু বিবেচনায় রেখেই অগ্রসর হতে হবে।

২. দ্বিতীয় আমল হলো, আল্লাহ ওয়ালাদের সংস্পর্শ লাভের চেষ্টা করবেন। তাদের সাথে বারবার সাক্ষাত করবেন। যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় তারাই আল্লাহওয়ালা। জীবন যাদের কুরআন হাদীসের বাস্তব ছবি, তারাই আল্লাহ ওয়ালা। যাদের আক্বীদা-বিশ্বাস- বক্তব্য কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থি নয় এবং আজগুবীও নয়, অধিকন্তু যাদের সংস্পর্শ হৃদয়ে আল্লাহ প্রেম ও দুনিয়ার প্রতি নির্মোহতা সৃষ্টি করে তারাই আল্লাহওয়ালা।

৩. তৃতীয় কাজ হলো, সর্বদা হক্কানী, আল্লাহভীরু ও সুন্নতের অনুসারী আলেমগণের গ্রন্থাবলি পাঠ করবেন। এতে ধর্মীয় মানসিকতা তৈরি হবে। অন্যায় কর্ম বর্জন করা আছান হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে ফ্যাশনের মরণ ছোবল থেকে রক্ষা করে সুন্নতের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দান করুন।

নদভী সাহেবের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর সভাপতির সংক্ষিপ্ত কথা ও মোনাজাতের পর তিনদিন ব্যাপী মহাসম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষিত হলো।

[একুশ]

নাজনীনের কাছে রায়হানের দেওয়া চিঠির কথা এ কান সে কান হয়ে এক সময় তা মাসুমের কানেও পৌঁছলো। একথা শুনে মাসুমের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। অস্ফুট সুরে বললো- আহা! স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েরা শরিয়তের বিধান না জানার কারণে এ ভয়ংকর পথে পা বাড়ায়। রায়হান যদিও কলেজের ছাত্র তবুও তাকে আমি হৃদয় দিয়ে মহব্বত করি। আপন ভাইয়ের মতোই আদর স্নেহ করি। সুতরাং কিছুতেই তাকে এই ধ্বংসাত্মক পথে বাড়তে দেওয়া যাবে না।

মাসুম বাসায় গিয়ে নাজিয়ার সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলো। নাজিয়া বললো, অবৈধ প্রেমের করুণ পরিণতি এবং এ ব্যাপারে ইসলামের কঠোর

নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ করে আপনি যদি রায়হান ভাইয়ের নিকট একখানা চিঠি লিখেন আর আমি যদি নাজনীনকে ডেকে নীরবে তাকে বুঝাই তাহলে মনে হয় ভালো হবে। মাসুম বললো, হ্যাঁ, প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে তাই করতে হবে। তুমি আজই নাজনীনকে ডেকে এসব কাজের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে বুঝিয়ে দাও। আর আমি রায়হানের নিকট চিঠি লিখছি।

ঐ দিন বিকালে মাসুম একখানা চিঠি লিখে রায়হানের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলো। চিঠিতে যা লেখা ছিলো তার সারমর্ম হলো, ভাই রায়হান! আমার কোনো ছোট ভাই নেই। তোমার সাথে পরিচিত হওয়ার পর তুমি যেমন আমাকে বড় ভাই হিসেবে মেনে নিয়েছো আমিও তোমাকে ছোট ভাই হিসেবে গ্রহণ করেছি। তুমি সুখি হও, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করো এ-ই তো আমি চাই। রায়হান! তুমি মনে কিছু নিও না। তোমার কল্যাণের জন্য একান্ত হিতৈষী হয়েই আমি তোমাকে কয়েকটি কথা বলছি। আশা করি কথাগুলো মানলে অনেক ফায়েদা হবে। বাঁচতে পারবে ভয়ানক পরিণতি থেকে।

রায়হান! নাজনীনের সাথে তোমার সম্পর্কের কথা আমি জানতে পেরেছি। মনে রেখো, তুমি যে পথে পা বাড়াচ্ছ সে পথ ধ্বংসের পথ, সে পথ লাঞ্ছনা ও অপমানের পথ। ইসলাম বিবাহপূর্ব এসব প্রেম-প্রীতি ভালোবাসাকে মোটেও সমর্থন করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে এর সবই হারাম। আমি আশা করি এ চিঠি পাওয়ার পর তোমার মন থেকে এসব চিন্তা ভাবনা একেবারে ধুয়ে মুছে ছাফ করে ফেলবে। জানি, এটা সহজ কাজ নয়, তারপরও তোমাকে করতে হবে। নাজনীন যদি তোমার ভাগ্যে থাকে, তবে এসব প্রেম-ট্রেম ছাড়াই তাকে পাবে। আমিও এ ব্যাপারে ফিকির করছি।

মনে রেখো, কষ্ট ও ত্যাগ ছাড়া দুনিয়াতে কিছুই পাওয়া যায় না। শরীরের সামান্য রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে গেলেও তিক্ত ঔষধ সেবন করতে হয়। দৈহিক রোগের যখন এ অবস্থা, তখন অভ্যন্তরীণ রোগের ক্ষেত্রে তো আরও বেশি ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের জন্য মনকে প্রস্তুত করতে হবে। তুমি ওর কাছে আর চিঠিপত্র দিও না। ওকে ভুলে যেতে চেষ্টা করো। আল্লাহ তোমার সহায় হোন। তোমার মঙ্গল কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

ইতি

তোমার বড় ভাই মাসুম।

এদিকে নাজিয়া ও নাজনীনকে ডেকে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বুঝালো। ফারহানার ঘটনাসহ আরও কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করে সে তাকে সতর্ক করলো। ফলে নাজনীন ওয়াদা দিলো। বললো, রায়হান ভাইয়ের নিকট যে চিঠিখানা দিয়েছি এটাই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি। জীবনে আর কোনো দিন কোনো ছেলের কাছে চিঠি দিবো না। অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলবো না। দুআ করবেন, আল্লাহ যেন আমাকে আমার প্রতিজ্ঞার উপর অটল থাকর তাওফীক দান করেন।

[বাইশ]

নাজনীনের সাথে রায়হানের কথা জেনে যাওয়ায় রায়হান তাবলীগ জামাতে বি.বাড়ীয়া এসেও মাসুমের সাথে দেখা করতে লজ্জাবোধ করলো। মাসুম না জানি তার সামনে পড়ে যায় এজন্য সে বাইরেও কম বেরুলো। কিন্তু শেষ রক্ষা তার হলো না। একদিন বাজারে যাওয়ার সময় সে মাসুমের সামনে পড়ে গেলো। মাসুম তো রায়হানকে দেখে হতবাক। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, আরে রায়হান! তুমি এখানে কোথেকে এলে? তাছাড়া তোমার গোটা দেহে দেখছি বেশ পরিবর্তন। ঘটনা কি সব কিছু খুলে বলো তো।

রায়হান বললো- ভাই! আমি বাড়িতে থাকার সময় তিনদিন ও দশদিন করে বেশ কয়েকবার সময় লাগিয়েছি। এবার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর সময় পেয়ে চিল্লায় চলে এসেছি। তাবলীগে এসে আমি বুঝতে পেরেছি দুনিয়া ও আখেরাতে প্রকৃত সুখ, শান্তি ও সফলতা অর্জন করতে হলে আল্লাহর হুকুম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী তরীকা অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ কারণেই আমার গোটা দেহে এই পরিবর্তন এসেছে। তাছাড়া সেদিন নদভী সাহেবের বয়ান শুনে পাক্কা এরাদা করেছি জীবনে কোনো দিন দাড়িতেও ক্ষুর লাগাবো না। দুআ করবেন, আল্লাহপাক যেন আমাকে দ্বীনের একজন খাদেম হিসেবে কবুল করেন।

মাসুম বললো- রায়হান! তোমার এ পরিবর্তনে আমি যার পর নাই খুশি হয়েছি। আরও বেশি খুশি হয়েছি দাড়ি না কাটার সিদ্ধান্তে। চল এবার বাসায় যাই।

রায়হান বললো- আমি তো এখন জামাতের সদাইপাতি কিনার জন্য বাজারে যাচ্ছি। আজ আমরা দুজনের উপর খেদমতের দায়িত্ব পড়েছে। ইনশাআল্লাহ আগামীকাল সকালে আমীর সাহেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আপনাদের বাসায় যাবো।

পরদিন রায়হান মাসুমদের বাসায় গেলে তাকে উত্তমরূপে আপ্যায়ন করা হলো। নাস্তার পর বিদায়ের প্রাক্কালে রায়হান নিজেই নাজনীনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললো- ভাইজান! শয়তানের ধোকায় পড়ে না বুঝে এমনটি করে ফেলেছি। আল্লাহ যেন আমাকে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে হেফাজত করেন এজন্য খাস করে দুআ করবেন। এ বলে রায়হান মসজিদের দিকে রওয়ানা দিলো।

[তেইশ]

মহাসম্মেলন শেষ হওয়ার প্রায় এক বছর পর মাসুম ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলো। পাঁচ ছয় দিন জ্বরের মাত্রা একশ তিন চার ডিগ্রি পর্যন্ত ছিলো। অসুস্থতার দিনগুলোতে স্বামীর সেবা ও খেদমতের যে অপূর্ব নজীর স্থাপন করেছে নাজিয়া, বর্তমান পৃথিবীতে তার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। সে দিনরাত জেগে জেগে স্বামীর মাথায় পানি দিতো। নিজের হাতে খানা খাওয়াতো। সময় মতো ঔষধ সেবন করাতো। এমনকি স্বহস্তে স্বামীর প্রস্রাব পায়খানা পর্যন্ত পরিস্কার করতো। আর ফরজ নামাজ ছাড়াও দৈনিক কয়েকবার দু' রাকাত নফল নামাজ পড়ে হাত দুটো উপরে তুলে দু চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলতো, ওগো দয়াময় প্রভু! তুমি আমার কলিজার টুকরা স্বামীকে সুস্থ করে দাও। তাকে আরোগ্য দান করো। তার এ কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছি না খোদা!

মাসুম অসুস্থ হওয়ার পর তাকে দেখার জন্য আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব অনেকেই এসেছেন। হাশেম খানও কয়েকবার তাকে দেখে গেছেন। সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। সেই সাথে একটি কথা বলতে চেয়েও না বলে চলে গেছেন।

বার দিন পর মাসুম সুস্থ হলো। সুস্থ হওয়ার পর আগের মতোই আপন কর্মে মনোযোগ দিলো। একদিন রাতে নাজিয়াকে ডেকে বললো- নাজিয়া! আমার অসুস্থতার সময় তুমি আমার জন্য খেদমত ও পরিচর্যার যে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শণ করেছো তা চিরদিন আমার হৃদয়ে ভাস্বর হয়ে থাকবে। দুআ করি আল্লাহ পাক এর বিনিময়ে আখেরাতে তোমাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আর এখন আমার সামর্থের মধ্যে যা চাইবে তাই পাবে। বলো, কী চাও তুমি।

নাজিয়া বললো- আমি আপনার নিকট দুনিয়ার কিছুই চাই না। চাই শুধু আপনার দুআ ও ভালোবাসা। চাই আপনার প্রেম। আপনাকে খুশি রেখে যদি মরতে পারি তবেই আমার নারী জীবন সার্থক হবে।

ঃ আর কিছু চাও না?

ঃ চাই আপনার সান্নিধ্য। আপনাকে বেশি বেশি একান্ত করে কাছে পাওয়া।

ঃ অবশ্যই পাবে তুমি। কারণ তুমি আমার জীবনের উজ্জল নক্ষত্র। রূপের চন্দ্র। ফুল না পেলে বুলবুলি যেমন, মধু না পেলে মৌমাছিরা যেমন বিচলিত হয়ে পড়ে তেমনি তোমাকে না দেখলে, তোমাকে কাছে না পেলে আমিও স্থির থাকতে পারি না নাজিয়া। কাছে এসো আজ তোমাকে একটি নগদ উপহার দিব। এ বলে মাসুম নাজিয়াকে .....।

নাজিয়া মৃদু হাসছিলো। স্বামীর কথা শুনে অন্তর তার খুশিতে ভরে গেলো। চেহারা খানি পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জল হয়ে উঠলো। প্রশান্ত মুখখানি হয়ে উঠলো রক্তিম। সহাস্যে বললো-

স্নেহপূর্ণ কথা আর মায়ার বদলে কায়া মথিত করার কৌশলটি খুব ভাল করেই রপ্ত করেছেন দেখছি।

ঃ এ কৌশল জানা কি অন্যায়? অপরাধ?

ঃ এটা যদি অপরাধ হয় তবে আপনার কাছ থেকে এমন অপরাধ প্রতিদিনই কামনা করি।

ঃ ধন্যবাদ তোমাকে। ধন্যবাদ তোমার এ অভিপ্রায়কে।

[চব্বিশ]

একদিন মাসুম নাজিয়াকে নিয়ে দুপুরে খানা খাচ্ছিলো। এমন সময় পিয়ন একটি চিঠি দিয়ে গেলো। রায়হানের চিঠি। খানা তাড়াতাড়ি শেষ করে চিঠিখানা খুলে পড়তেই মাসুমের মুখখানা মলিন হয়ে গেলো। নাজিয়া বললো-মন খারাপ করেছেন কেন? চিঠিতে কোনো দুঃসংবাদ আছে নাকি? মাসুম বললো- গত শুক্রবার রায়হানের মা ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না-লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ঃ তবে তো রায়হান ভাইদের বাড়িতে মহিলা বলতে আর কেউ রইলো না। তাদের বাসার রান্না এখন কে করবে?

ঃ হ্যাঁ, তাই তো ভাবছি।

ঃ এখন তাহলে রায়হান ভাইকে বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

ঃ তুমি ঠিকই বলেছো। দেখা যাক কি হয়।

এ সংবাদ পাওয়ার আট দশ দিন পর হাশেম খান এক রকম অসুস্থ শরীর নিয়ে মাসুমদের বাসায় আসলেন। তাহের তামান্না খান সাহেবকে দাদু বলে ডাকতো। তিনি রুমে এসে বসতেই তাহের তামান্না দৌড়ে এসে বললো- দাদু কেমন আছেন?

ঃ খুব ভাল আছি দাদু! তোমরা কেমন আছো?

ঃ আমরাও অনেক ভাল। নাজনীন ফুফীকে নিয়ে আসলেন না কেন? তাকে না আমাদের খু----ব ভালো লাগে।

ঃ সে কলেজে পরীক্ষা দিতে গেছে। পরীক্ষার পর আসবে। কেমন?

ঃ আচ্ছা ঠিক আছে।

ঃ দাদু আমি না কুরআন শরীফের কয়েকটি সূরা মুখস্থ করেছি। তাহের বললো।

ঃ শুনাও তো দেখি কেমন শিখেছো তুমি।

তাহের সূরায়ে ফীল তিলাওয়াত করে শুনালো। এরপর বললো, দাদু আমি আরও বড় বড় সূরা পারি।

ঃ আমিও পারি দাদু। তামান্ন বললো।

ঃ এবার তাহলে তুমি একটি বড় সূরা শুনাও। খান সাহেব তামান্নাকে লক্ষ্য করে বললেন।

তামান্না সূরা ত্বীন অত্যন্ত সুন্দর করে পাঠ করে শুনালো। তাদের তিলাওয়াত শুনে খান সাহেব মনে মনে আফসোস করে বললেন- আহা! এত ছোট বাচ্চারা কত সুন্দর করে কুরআন পড়তে পারে। কিন্তু আমি বুড়ো হয়েও পারি না। হায়! আমি যদি পারতাম।

এমন সময় আসসালামু আলাইকুম বলে মাসুম ঘরে প্রবেশ করলো। খান সাহেবকে দেখে অত্যন্ত খুশি হয়ে মাসুম বললো- আপনি এসেছেন খুব ভালো হয়েছে। আজকে দুপুরের খানা খেয়ে তারপর যাবেন।

খান সাহেব বললেন, খানা আরেকদিন খাওয়া যাবে। আজ একটি জরুরি কথা বলার জন্য এসেছি। কথাটি হলো, আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি। কখন দুনিয়া থেকে চলে যাই বলা যায় না। জীবনে তো ধর্ম-কর্ম করি নি বললেই চলে। তাই শেষ অবধি চেয়েছিলাম মেয়ে নাজনীনকে যদি একটি দ্বীনদার ও সৎ ছেলের হাতে উঠিয়ে দিতে পারতাম তবে মরে গিয়েও আমি শান্তি পেতাম। আর এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বটি তোমার হাতেই আমি অর্পণ করতে চাই।

জবাবে মাসুম বললো, চাচা! আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। এ ব্যাপারে আমি আন্তরিকভাবেই চিন্তা ফিকির করবো।

এমন সময় সোহাইল চা-নাস্তা নিয়ে এলে খান সাহেব তা খেয়ে কথাটি আবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিদায় নিলো।

[পঁচিশ]

ঐদিন বিকালেই রায়হানের আরেকখানা চিঠি মাসুমের হস্তগত হলো। চিঠিতে অনেক কিছু লিখার সাথে একথাও লিখা ছিল- ভাইজান! বাড়িতে রান্না বান্না করে খাওয়ানোর মতো কোনো মেয়েও নেই। একা একা কিছুই ভালো লাগে না। গত কয়েক দিন পূর্বে একটি কওমী মাদরাসায় বাংলা শিক্ষকের পদে নিয়োগ পেয়েছি। আশা করি আমার ব্যাপারে অতি গুরুত্ব দিয়ে ভাববেন।

মাসুম-নাজিয়াদের সংস্পর্শে এসে নাজনীন ও ফারহানা এতদিনে পূর্ণ দীনদার হয়ে গেছে। সুতরাং তাদেরকে দ্বীনদার পরহেযগার ও আল্লাহভীরু পাত্রের হাতে তুলে দেওয়াই এখন গুরুত্বপূর্ণ কাজ। খান সাহেবের ন্যায় ফারহানার মামী আতিকা বেগমও নাজিয়ার কাছে বলেছেন, আপনারা স্বামী-স্ত্রী মিলে পরামর্শ করে ফারহানার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিবেন তা-ই আমরা মেনে নিবো।

একদিন মাসুম নাজিয়াকে বললো- নাজিয়া! ফারহানাকে তো এক দুর্ঘটনার সময় অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও এক নজর দেখেছিলাম। তার ব্যাপারে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত আমি নিয়ে নিয়েছি। বাকি তুমি রায় দিলেই সেটা ফাইনাল হবে। আর নাজনীনকে তো কখনো আমি দেখি নি। সুতরাং সে দেখতে কেমন এবং রায়হানের সাথে তাকে মানাবে কিনা একটু বল তো।

নাজিয়া বললো- সুন্দরী। খুবই সুন্দরী। চাঁদের টুকরো। যেন আকাশের পরী, জান্নাতের হুর। সৌন্দর্যের রাণী সে। আল্লাহ যেন নিজ হাতে এমন মনোলোভা করে তৈরি করেছেন তাকে। একবার দেখলে চোখ ফিরানো যায় না। রায়হান ভাইয়ের সাথে তাকে অপূর্ব মানাবে।

মাসুম বললো, তবে তো কোনো কথাই নেই। আর ফারহানার জন্য রাইহানেরই এক দূর সম্পর্কের চাচাত ভাইকে ঠিক করেছি। ছেলেটির নাম আসআদ। এদের বর্তমান বাড়ি ঢাকা কমলাপুরে। ছেলেটি বেশ দীনদার। তাবলীগ জামাতে চিল্লা লাগিয়েছে। বর্তমানে একটি বেসরকারী ফার্মে ভালো বেতনে চাকরি করছে। দেখলে তাকে একজন মাওলানা বলেই মনে হয়। সেদিন ঢাকায় গিয়ে তার পিতার সাথেও এ ব্যাপারে আলাপ করেছি। তিনি আমার কথায় ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। আশা করি উভয় ক্ষেত্রেই আমরা সফল হবো।

এর কিছুদিন পর উভয় পক্ষের সাথে ফাইনাল কথাবার্তা ও অন্যান্য কাজ সেরে মাত্র ৫ দিনের ব্যবধানে সুন্নত অনুযায়ী নাজনীন ও ফারহানার বিয়ে হয়ে গেলো।

বিয়ের মাসখানেক পর একদিন সন্ধ্যায় ফারহানা ও নাজনীন একত্রে নাজিয়াদের বাসায় এলো। সাথে ছিল নিজ নিজ স্বামী।

এ সময় নাজিয়া মাসুমের কাছে ছিল। মেহমানদের আগমনের কথা শুনে তাদের কাছে নাজিয়া পৌঁছলেও তার মন থেকে মাসুমের সুন্দর হাসির প্রতিচ্ছবি তখনো মিলে যায় নি। ওর মিষ্টি কণ্ঠের প্রতিধ্বনি তখনও ভাসছে তার কানে। তার চোখ দুটি তখনো জীবন সাথীর সঙ্গ পরশে লজ্জাবনত। ভালোবাসার গুপ্ত আলোড়ন প্রতিভাত হচ্ছে তার চেহারায়। সন্ধ্যাটা যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে নাজিয়ার কাছে।

স মা প্ত

পরবর্তী বই
নারী জীবনের চমৎকার কাহিনী

পাঠকের মতামত

প্রিয় লেখক! আমি আপনার হৃদয় গলে সিরিজের কয়েকটি বই পড়েছি। আমার কাছে সিরিজটি অত্যন্ত ভাল লেগেছে। যার কারণে একটি বই বারবার পড়া সত্ত্বেও আবারও পড়তে মন চায়। যখনই যেথায় পাই তখনই এক বৈঠকে শেষ করে ফেলি। আর আমি তো ইতোমধ্যে অনেককে বলেছি, যদি কোনো বই পড়তে চাও তাহলে হৃদয় গলে সিরিজের প্রতিটি বই পড়ো। তাহলে নিজের মাঝে নিজে পরিবর্তন অনুভব করতে পারবে। আমাকে তারা প্রশ্ন করে- কেনো? আমি তাদের বলেছি, আমি অনেক বই পড়েছি কিন্তু এই সিরিজ আমাকে যেভাবে গুনাহ থেকে হিফাজতের সহায়ক হয়েছে, তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। তাই হৃদয় গলে সিরিজের কাছে আমি চির ঋণী। আমি সমস্ত পাঠকের পক্ষ থেকে হৃদয় গলে সিরিজকে জানাই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমার বাসা থেকে প্রশ্ন করেছিলো, তোর মাঝে এমন পরিবর্তন কে করলে রে? তখন আমি বুক ফুলিয়ে গর্বের সাথে বলেছিলাম, হৃদয় গলে সিরিজ। আলহামদুলিল্লাহ, ইতোমধ্যেই আমাদের বাসায় সিরিজটির প্রত্যেক সংখ্যা সংগ্রহের জন্য চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। পরিশেষে জনাবের সমীপে বিনীত প্রশ্ন, সিরিজটি কি প্রতি দু মাসের পরিবর্তে এক মাসে বের করা যায় না? যদি যায় তাহলে আশা করি মতামত বিভাগের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন।

এইচ, এম, জাকারিয়া (খুলনা)
আরবি ১ম বর্ষ, মাসনা (দাওরায়ে হাদীস) মাদরাসা
মনিরামপুর, যশোর।

হৃদয় গলে সিরিজের সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ! সিরিজের বই পড়া নিয়ে মগ্ন হয়ে গেছেন। কিন্তু আপনার আশ পাশের খবর নিয়েছেন কি? শুধু নিজে পড়লে চলবে না, এবার বই বন্ধ করুন, মাথা উঠান, প্লিজ বন্ধু মাথা উঠান। ডান দিক বাম দিক তাকান। কী, কিছু দেখতে পাচ্ছেন? দেখতে পাচ্ছেন না?

তাহলে সামনে বাড়ুন। এবার দেখতে পাচ্ছেন তো? কী দেখতে পাচ্ছেন? শিশু কিশোর ও তরুণ-তরুণীরা বই পড়ছে। তারা কী বই পড়ছে? অনেকে পড়ছে মিনা-মিঠুর গল্প, ভূতের গল্প, আবার কেউ পড়ছে কুখ্যাত হুমায়ুন আজাদ ও তসলিমা নাসরিনের লেখা বই। আবার কেউ পড়ছে নোবেল উপন্যাস ও উলঙ্গ বেহায়াপনা ম্যাগাজিন ও পত্র-পত্রিকা। আমার প্রশ্ন হলো, এ দৃশ্য দেখে আপনার কাছে কেমন লাগছে? নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে। তাহলে দেরি করছেন কেন? তাদেরকে বাঁচান, বোঝান। তাদের হাত থেকে এগুলো সরিয়ে নিয়ে আপনার আমার সুপ্রিয় হৃদয় গলে সিরিজের একখানা বই তুলে দিন। তাহলে দেখবেন এই সিরিজের বই পড়ে তারা ঐসব নোবেল ও অশ্লীল পত্র-পত্রিকা পড়া ছেড়ে দিবে। আর আপনিও হয়ে গেলেন অনেক ছওয়াবের অধিকারী। এছাড়া আশপাশের কোনো পাঠাগার থাকলে পাঠাগারের পরিচালককে সিরিজের বইগুলো রাখার জন্য পরামর্শ দিতে পারেন। আবার কোথাও বেড়াতে গেলে ব্যাগে করে সিরিজের একখানি বই নিয়ে যাবেন। আত্মীয় স্বজনকে মাঝে পড়তে দিবেন অথবা পড়ার জন্য উৎসাহিত করবেন। কী, কাজটা কি খুব কঠিন?

পাঠক বন্ধুরা! এখন চলে যাচ্ছি লেখক ভাইয়ার কাছে। ভাইয়া! সিরিজের জগতে আপনার হৃদয় গলে সিরিজ অন্যতম। যে একবার পড়বে সে এই সিরিজ আর কোনো দিন সরাতে পারবে না বলে আমার বিশ্বাস। ভাইয়া বইকে সুন্দর করার লক্ষ্যে আমার মনের একটি আকাঙ্খা পেশ করছি। কথা হলো, যে গল্পে হৃদয় গলে নাম দিয়ে ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড পর্যন্ত বের করা হয়েছে। এর পর বের হয়েছে যে গল্পে অশ্রু ঝরে, যে গল্পে হৃদয় কাঁদে, আমার আকাঙ্খা হলো, এগুলোর মতো 'যে গল্পে' কথাটি বহাল রেখে বাকি সিরিজগুলোর নাম দেওয়ার জন্য। এতে অনেক উপকার হবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ শিশু কিশোর ও ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন গল্পের বই খুঁজে। তারা যখন বইয়ের কভারে গল্প কথাটা লেখা দেখবে তখন বইটি কিনতে আগ্রহী হবে। তাই যে গল্পে কথাটি বহাল রেখে আমি নিম্নে কিছু নতুন নাম পেশ করলাম। যেমন যে গল্পে পাথর গলে, যে গল্পে নফস কাবু হয়, যে গল্পে আত্মা শান্তি পায়। যে গল্পে জান্নাতের লোভ ও জান্নামের ভয় আসে। যে গল্পে এবাদত করতে উৎসাহ জাগে, যে গল্পে গুনাহ থেকে বাঁচা

যায়, যে গল্পে ইসলামের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়. যে গল্পে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়, যে গল্পে নেকী হয়। ঐ নামগুলো থেকে যদি এক দুইটি নামও গ্রহণযোগ্য হয় তবে আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া। এই সিরিজ ও এর লেখক-পাঠক সবাইকে আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। আমীন।

হাফেজ মোঃ জাবেদ হোসাইন (সুজন)
প্রযত্নে পিতা মোঃ নান্নু মিয়া
পানিয়ারূপ, কসবা, বি.বাড়ীয়া।

হে প্রাণপ্রিয় হৃদয়গলে সিরিজ! পৃথিবী যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিধর্মীরা যখন ধরা পৃষ্ঠ হতে ইসলামের নাম নিশানা মুছে দেওয়ার জন্য উঠে পরে লেগেছে, নানা কৌশলে মুসলমানদের ধর্মান্তর করার পায়তারা করছে, দীনের আলো নিভে যাওয়ার কাছাকাছি পৌছে গেছে, ঠিক তখনই তুমি আলোর দিশারী হয়ে প্রকাশিত হলে। তুমি অন্ধকার পৃথিবীতে সূর্য সমতুল্য।

তোমার জ্যোৎস্নায় পথ পায় পথহারা হাজারো মুসাফির। তোমার কোনো তুলনা হয় না। তুমি এ পৃথিবীতে আগমন করেছো খালিদ, ওমর, তারিক এবং সালাহউদ্দিন আইয়ূবীর উত্তরসূরীদের জাগ্রত করার জন্য। তুমি কি জানো না তোমাকে পেয়ে আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়েছি। তোমার প্রতিটি কথা এতো সুন্দর যা আমাদের হৃদয়কে পুলকিত করেছে। কোন্ ভাষায় তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো সেই ভাষা আমার জানা নেই। তুমি দিয়েছো আমাদের নতুন দিগন্তের সন্ধান। কোনো বন্ধুকে কোনো কিছু উপহার দেওয়ার সময় তোমার কথা শুধু মনে জেগে উঠে। বইয়ের মাঝে তোমার স্থান শীর্ষে। ও হ্যাঁ, জানতে পেলাম তুমি নাকি আর সামনে এগুচ্ছো না। তাহলে আমরা বাঁচবো কিভাবে? তুমি হাজার মানুষের মনে ব্যাথা দিয়ে চির দিনের জন্য চলে যাবে? এমন কাজ কখনো করবে না। যতদিন বেঁচে আছো, সামনে অগ্রসর হতে থাক। আর তোমার লেখকের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। অশ্লীল বই পুস্তকাদির ব্যাপারে তিনি মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন। আমরা সবাই তাঁর কাছে চিরঋণী। এই ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। তাই সবশেষে তোমার লেখককে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় নিলাম।

সোনালী সংসার/১০১

তুমি আমার নীল আকাশের একটাই চাঁদ,
তুমি আমার হৃদয় রাজ্যের একটাই গোলাপ।

মুহাম্মদুল্লাহ মাসুম
পল্লবী আফতাব উদ্দীন মাদরাসা
একাদশ শ্রেণী (শরহে বেকায়া)
বর্ধিত পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

বহু দিন যাবত সন্ধানী চোখ দুটি বারবার শুধু খুঁজে ফিরছিলো এমন একটা জিনিস, যে জিনিসটা আমাকে সদা সর্বদা সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় একটু আনন্দ দিয়ে রাখবে। এই হাতাশা আর অশান্তির মধ্য থেকে হঠাৎ মিলে গেল অভাবনীয় শান্তির ঠিকানা। অবশ্যই প্রশ্ন আসতে পারে, এমন দুরাবস্থায় এমনকি আবার পেয়ে গেলাম, যা আমাকে এত আনন্দিত করলো? হ্যাঁ অবশ্যই আর দেরি করবো না। এখনই বলছি। উহা অপরিচিত কিছুই নয়, উহা হলো মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলামের হৃদয় গলে সিরিজ।

প্রাণের 'হৃদয় গলে সিরিজ! শুরুতেই তোমাকে জানাই ঈদুল ফিতরের মহানন্দের মহা শুভেচ্ছা। আশা করি তোমার পরিবারবর্গকে নিয়ে ভালোই আছ। আর মহা ধুমধামের সাথেই ঈদুল ফিতর উপভোগ করছো। আমিও কিন্তু খুশি। খুব খুশি এবং আনন্দিত। তবে কিন্তু আমি ঈদুল ফিতরের আনন্দ নিয়ে বসে রইনি। কারণ ঈদের খুশি শুধু ঐদিন দুপুর পর্যন্তই থাকে। পরে সব মাটি হয়ে যায়। তবে তুমি প্রশ্ন করতে পার যে, তাহলে আমি কিসের জন্য এত খুশি? হুজুর (সা.) বলেন, মুসলমানের ঈদ দুটি। কিন্তু আমার বলতে ইচ্ছা করে এ দুই ঈদ ছাড়াও আমার জন্য প্রতি দু মাসান্তর একটি ঈদ ঘটে। আমি ঈদে যে আনন্দ উপভোগ করি তার চেয়েও বেশী নিজেকে আনন্দের জগতে হারিয়ে ফেলি তখন, যখন প্রতি দু'মাস অন্তর তোমার সিরিজের নতুন খন্ড আমার হাতে আসে। আমি মনে করি তোমার কোন প্রশংসা করার প্রয়োজন নেই। কারণ তোমার প্রশংসা তো একমাত্র তুমিই! তবে আমি তোমাকে কিসের জন্য বিরক্ত করলাম জানো? তুমি আমাকে সব চাইতে আমার প্রিয় সন্ধানকৃত জিনিসটিকে উপহার দিয়েছো। তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ যদি দু'কলম না লিখি, তাহলে তোমার সাথে আমার চরম ছোটলোকী ও অকৃতজ্ঞতার প্রমাণ হবে। এ জন্য তোমাকে বিরক্ত করলাম। কী রাগ

করলে না তো? তাহলে কিন্তু খুব দুঃখ পাবো। মনের প্রিয় বস্তুটি যদি রাগ করে তাহলে বড়ই দুঃখ হয়। নাহ..... এখন রাখি। তোমার আরও অনেক বন্ধু তোমার সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষায় আছে। আল্লাহ যদি হায়াতে তায়্যিবাহ দান করেন তাহলে সামনের সংখ্যায় বিস্তারিত আলাপ করবো কেমন? ও আচ্ছা..... আরেকটি কথা। তোমার পরিবারের কাছে আমার আন্তরিক সালাম ও দোয়ার দরখাস্ত রইলো। অবশ্যই পৌঁছাবে। তোমার মঙ্গল কামনা করে এখানেই বিদায় নিলাম। তোমার প্রিয় বন্ধু।

মুহাঃ হাবিবুর রহমান মিছবাহ
রঘুনাথপুর ওয়াপদা
বহরিয়া, চাঁদপুর

হৃদয় গলে সিরিজ! তোমাকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন। তুমি প্রত্যেক পাঠক পাঠিকার হৃদয়ে স্থান পেয়েছো। তোমাকে নিয়ে কী লিখব ভেবে পাচ্ছি না। অবশষে অনেক ভেবে চিন্তে তোমাকে নিয়ে ছোট্ট একটি কবিতা রচনা করেছি। কবিতাটি গ্রহণযোগ্য হলে নিজকে সার্থক মনে করবো।

হৃদয় গলে সিরিজ তুমি এত চমৎকার,
সারা বেলা তোমায় নিয়ে করি অহংকার।
হৃদয় গলে সিরিজ তুমি কতো যে সুন্দর,
তুমি কেবল মুগ্ধ করলে সবারই অন্তর।
এক থেকে দ্বাদশ খন্ড কিনে ফেলেছি
সবটুকু না পড়িলেও অধিক পড়েছি।
তোমায় পড়তে লাগে ভালো খাঁটি মধুর মতো,
আনন্দে আত্মহারা হই, তোমায় পড়ি যত।
তোমার তরে অনেক মানুষ লিখে অভিমত,
হেদায়েতের তরে দেখাও সরল সঠিক পথ।
এমন লেখক ভুবন জুড়ে আর কেউ কি হবে?
মরে গেলেও তাঁর স্মৃতি পাতায় পাতায় রবে।

মোঃ শফিকুল ইসলাম
তুলাতলী (মুন্সীবাড়ী), রায়পুরা, নরসিংদী।

প্রিয় লেখক, প্রথমেই আমার শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ের ভক্তি ও সালাম গ্রহণ

করবেন। আমি একজন ছাত্রী। আমি বই পড়তে খুব ভালোবাসি। বিশেষ করে ভালো বই। ভালো বই শুধুমাত্র জ্ঞানার্জনের উপায় নয় বরং তা সত্য সুন্দর ও আনন্দময় অনুভূতিতে পাঠকচিত্তকে আলোড়িত করে। হতাশা, ক্লান্ত, বিভ্রান্ত ও নৈরাশ্যগ্রস্থ মানুষকে পৌঁছে দেয় জীবনের এক মহৎ প্রাঙ্গনে। পাষান্ড প্রাণ খুঁজে পায় আবার নতুন করে মনুষত্ব। একটি ভালো বই দিতে পারে পথহারা মানুষকে পথের দিশা। ঠিকানাহীন মানুষকে দিতে পারে মনুষত্ব অর্জনের নতুন ঠিকানা। ঠিক এরকমই একটা ঘটনা ঘটেছে আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে। আপনার হৃদয় গলে সিরিজের এক এক করে প্রায় সবগুলো খন্ডই পড়েছি আমি। আমার এমনও কোনো রাত কেটেছে যে, আপনার হৃদয়গলে সিরিজের বই নিয়েই বসে কাটিয়েছি। আসলে যতটা সময় আমি অবসর ও ঘরে থাকি বই নিয়েই বসে থাকি। এমন কি এক সময় এরই মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম থেকে জেগেও মাঝে মাঝে বিস্মিত হই যে, বইটা এখানো আমার হাতেই আছে, বিছানায়ও পড়ে নি। এভাবেই সিরিজের সবগুলো বই শেষ করার পর যখন ১১তম সিরিজ 'হারানো দিনের সোনালী কাহিনী, আমাকে একজন আদর্শবান ব্যক্তি উপহার দিল তখন আমি বইটি পড়ে আমার হৃদয়কে আরেক জগতে হারিয়েছি। প্রথম দুইটি গল্প 'সংযম অবলম্বনের শুভ ফল' ও 'ছেলের সাথে মায়ের বিয়ে' খুব বেশি ভালো লেগেছে। আসলে ছেলে তো এমনই হওয়া চাই। এই তো সুন্দর চরিত্র। এরাই তো সত্যিকার মানুষ। আর হযরত আলী (রা.) কত যে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তা তো নবীজির (সা.) ঐ হাদীসই প্রমাণ। তিনি বলেছেন, আমি জ্ঞানের ভান্ডার আর আলী (রা.) হলো সে ভান্ডারের দরজা। সত্যিই আপনার বইগুলো আমাকে অতি আনন্দ দিয়েছে। যদিও বইটির মূল্য মাত্র ৪০ টাকা কিন্তু এর লেখাগুলোর মূল্য ৪০ কোটির চেয়েও অধিক। এটা শুধু আমার কথা নয়, যারা জ্ঞানী তারাই বলেছে একথা। সত্যিই আপনার লেখা অসীম প্রশংসনীয়। প্রতিটি গল্পই হৃদয় বিদারক ও মর্মস্পর্শী। যা মানুষকে চরিত্রহীন থেকে সুচরিত্র দান করে। আপনার সিরিজের বইগুলো আমার কয়েকজন বান্ধবীকে পড়তে দেই। আলহামদুলিল্লাহ, সকলেই উপকৃত হয়েছে। এমনকি অনেকে চির শপথও করেছে, টেলিভিশন ও বেপর্দা হতে বিরত থাকবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যারা আজেবাজে গল্প উপন্যাস নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাদের হাতে যদি বইগুলো তুলে দেওয়া যায় তাহলে অবশ্যই তারা সত্য, সুন্দর ও হেদায়েতের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ হবে ইনশাআল্লাহ। আমি

দোয়া করি মহান আল্লাহ পাক যেন এই গ্রন্থের অসিলায় পথ হারা উম্মতদেরকে সঠিক পথের সন্ধান মিলিয়ে দেন। মারিফাত হাসিল করার রাস্তা খুলে দেন। আপনি আপনার হৃদয় গলে সিরিজ ধারাবাহিক ভাবে চালিয়ে যাবেন। আশা করি আপনার শ্রম কখনো বৃথা যাবে না। আল্লাহ আপনাকে আরও বেশি লিখার তৌফিক দান করুন, আমিন। ছুম্মা আমিন।

মোসাম্মৎ সারমিন আক্তার মদিনা
পুরান বাজার ডিগ্রী কলেজ
দ্বাদশ শ্রেণী বিজ্ঞান বিভাগ
শাখা- ক, চাঁদপুর।

সম্মানিত লেখক! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি সোহাগ পুর দারুল উলূম মাদরাসার নবম শ্রেণীর একজন নগণ্য ছাত্র। আমি যখন ৭ম শ্রেণীতে পড়ি তখন আমাদের মাদরাসার নিয়মিত জলছা 'সাপ্তাহিক জমিয়তুত তলাবা' ছাত্র ভাইদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলাম। সেই ভাষণে মুগ্ধ হয়ে আমার এক সাথী ভাই আমাকে একটি বই উপহার দেয়। বইটির নাম যে গল্পে হৃদয় গলে। বইটির নাম দেখেই আমি অনুভব করেছিলাম, নিশ্চয় এটা একটি চিত্তাকর্ষক গল্পের বই হবে। আমার ধারণা ভুল হয় নি। আমার জীবনের প্রারম্ভ থেকে এই পর্যন্ত যতগুলো বই পাঠ করেছি তম্মধ্যে পরবর্তীতে এর মধ্যে সবচেয়ে মুগ্ধকর ও আকর্ষণীয় বই হিসেবে আপনার রচিত যে গল্পে হৃদয় গলে বইটিই নির্বাচিত হয়েছে। বইটি পাঠ করে আমি সীমাহীন আনন্দ অনুভব করেছি। এর প্রতিটি হৃদয় বিদারক ও মর্মস্পর্শী কাহিনী আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি হৃদয় গলে সিরিজগুলোর বেশ কয়েকটি সিরিজ পাঠ করেছি। সত্যিই একজন মানুষের জীবনে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সিরিজগুলো যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপনি যে সম্ভার দ্বারা সিরিজগুলো সাজিয়েছেন এবং সিরিজগুলোর যে চমৎকার নাম দিয়েছেন, যে কোন পাঠক মহলের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমি মনে করি। পরিশেষে আপনার কাছে সবিনয় অনুরোধ রাখবো, আপনি সিরিজের ধারাবাহিকতা বন্ধ করবেন না। আমি হৃদয় গলে সিরিজের ন্যায় আরও কিছু সিরিজ কামনা করি। আমরা আপনার মতো লেখককে নিয়ে গর্ববোধ করি। আল্লাহপাক আপনাকে আরও লিখার তাওফীক দান করুন। আমীন

হৃদয় গলে সিরিজ তুমি মুগ্ধ করলে মন,
তোমায় নিয়ে ব্যস্ত থাকি আমি সারাক্ষণ।

মোঃ জসীমউদ্দীন
নূরপুর (লক্ষণপাড়া) নাছিরনগর, বি.বাড়ীয়া।

প্রিয় লিখক ভাইয়া! ভালো আছেন তো? ভালো থাকাই আমি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি। যাতে করে সাড়া জাগানো শ্রেষ্ঠ সিরিজ যার নাম আজ শুধু বাংলাদেশে নয় সারা বিশ্বের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমি নোয়াখালী জামেয়া ইসলামিয়ার জামাতে হাশতমের একজন ছাত্র। আমি আমার এক বন্ধুর উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে আপনার হৃদয় গলে সিরিজের প্রথম নয়টি সিরিজ একত্রে ক্রয় করি এবং ধারাবাহিকভাবে পড়ে শেষ করি। এতে নিজের মধ্যে উপদেশমূলক বাণীগুলো ফিট করতে না পারলেও গর্হিত কাজগুলো পরিত্যাগ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ডের চমৎকার গল্পগুলো পড়ার পর বাকী বইগুলো এক বৈঠকে শেষ করার জন্য আমার মনের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। এমন করে একটার পর একটা শেষ করার আগেই ১০ নম্বর সিরিজ বের হয়েছে শুনে যারপর নাই আনন্দিত হই। ক্রমে ক্রমে আপনার সিরিজ বের হয়। আর আমাদের মত পাঠকদের আনন্দ বেড়ে যায়। তাই আমি মনে করি আপনি শত শত পাঠক পাঠিকাদের মনে আনন্দের দ্বার উন্মুক্ত করে ভোরের স্নিগ্ধ সজীব বাতাসের মতো হিমেল পরশ বুলিয়ে দিচ্ছেন। পরিশেষে দোয়া করি, যেন জান্নাতের সুশিতল ছায়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন এবং সুপারিশ করে আমাদেরকেও সাথে নিতে পারেন।

হাফেজ মোঃ মুজিবুর রহমান মামুন
জামেয়া ইসলামিয়া মাইজদী, নোয়াখালী, বাংলাদেশ।

সম্মানিত লেখক ভাইয়া! আমি একজন মাদরাসার ছাত্র। ছোট বেলা থেকেই বই পড়া আমার অভ্যাস। আমি অনেক ইসলামী বই সংগ্রহ করে পাঠ করেছি কিন্তু আপনার সংকলিত 'যদি এমন হতাম' বইটি পাঠ করে আমি মুগ্ধ হয়েছি এবং কতটুকু আনন্দ আমি পেয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো ক্ষমতা আমার নেই। আমি আপনার একটি বই পাঠ করার পর সবগুলো

বইই সংগ্রহ করে ফেলেছি। আপনার বইগুলো যেন হাজার হাজার ফুলের মাঝে রক্তিম ফুটন্ত গোলাপের ন্যায়। সত্যি আপনার বইগুলো উত্তম চরিত্র গঠনের উত্তম মাধ্যম। বইগুলোর প্রত্যেকটি ঘটনাই লোমহর্ষক ও হৃদয়বিদারক। বস্তুতঃ সিরিজগুলোর কোনো তুলনাই হয় না।

সর্বশেষে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আপনাকে আরো কিছু ইসলামী বই লিখে মানবজাতির কল্যাণের পথ দেখানোর মতো তৌফিক দান করেন, আমীন।

হাফেজ মোঃ আবুল কালাম
বেড়তলা, সরাইল, বি.বাড়ীয়া।

প্রিয় লেখক ভাইয়া! আসসালামু আলাইকুম। আমি একজন কওমী মাদরাসার ছাত্র, নতুন হেফজ শেষ করে শুনাচ্ছি। আমার কোনো বই পড়ার নেশা ছিল না। একদিন আমাদের হেফজ বিভাগের এক ছাত্র ভাই আপনার হৃদয় গলে সিরিজের ৪ নম্বর খন্ড যে গল্পে অশ্রু ঝরে থেকে একটি ঘটনা আমাকে পড়ে শুনালো। আমি বইটা সংগ্রহ করে নিলাম এবং এক এক করে সব কয়টি ঘটনা পড়লাম। তারপর আমি আমার আম্মুকে পড়তে দিলাম। আম্মু বই পড়ে আব্বুকে শুনালো। তারপর একটা করে সব কয়টি খন্ড কিনে ফেললাম। আপনার বইগুলো আমার জীবনের গতিধারা অনেকটা বদলে দিয়েছে। একজন মুসলিম ছেলে হিসেবে আমার করণীয় বর্জনীয় কী তা এখন শিখতে পারছি। সত্য ও সুন্দরের সন্ধান পেয়ে আমি যেন এক নব জীবন লাভ করেছি।

আমার জীবনের এ পরিবর্তনের জন্য আমি আপনার নিকট চিরঋণী হয়ে থাকলাম। আমার বিশ্বাস, হৃদয় গলে সিরিজ পড়ে আমার মতো হাজার মানুষের জীবন সুন্দর হবে। সত্যের পথে চলতে উৎসাহিত হবে।

হাফেজ মোঃ তাসলিমুল আলম (মুকুল)
গ্রাম ঃ দামুদার কাটি, পোস্ট ঃ হেলাতলা
থানা কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
০১৭৮২৪৮০৯৯

প্রিয় লেখক! প্রারম্ভে রইলো আমার হৃদয়ের গহীন থেকে অফুরন্ত ভালবাসা ও সালাম। ভাবছেন আমি কে হতে পারি? তাই না? আমি আর কেউ নই, আমি হলাম আপনার একজন ভক্ত ও অনুরাগী পাঠক। হৃদয় গলে সিরিজের ৪র্থ বইটি পড়ে আমি ঢের উপকৃত হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ আপনার বই পাঠ করার পর থেকেই আপনার প্রতি এক অজানা ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে।

হে আমার প্রিয় লেখক, আপনি আপনার শাণিত কলম দ্বারা যদি পর্দা সংক্রান্ত একটি বই প্রকাশ করেন তাহলে নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহর অগণিত লাভ হতো। আল্লাহ আপনাকে এমন একটি বই লিখার তৌফিক দান করুক। এই শুভ কামনায় এখানেই ইতি টানলাম।

মোঃ আনোয়ার হোসাইন
লালগাজী হাজী বাড়ি
গ্রাম ঃ ওয়াছেকপুরী, পোঃ শান্তির হাট,
সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।

শ্রদ্ধেয় লেখক ভাইয়া, আমি উপন্যাস পড়তে খুব ভালবাসতাম না। একদিন আমার এক ছাত্র ভাই আমাকে আপনার ১১ নম্বর সিরিজ 'হারানো দিনের সোনালী কাহিনী' বইটি পড়তে দিল। বইটি পড়ে এতো ভালো লাগলো যে, আমি কিনে নিলাম। এরপর অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, এথকে এক এক করে সবগুলো বই কিনে ফেললাম। তারপর থেকে আপনার বই ছাড়া থাকতে পারি না। আমি মনে করি আপনার লেখায় হয়তো যাদু আছে। না হলে হঠাৎ করে আমার মন এতো কেড়ে নিল কেন? আমি আপনার সুস্থ, সুন্দর ও সুখময় জীবন কামনা করি।

হাফেজ মোঃ তাজুল ইসলাম
পিতাঃ আলহাজ্ব ডাঃ মোঃ জিয়াদ আলী
পাটকেল ঘাটা (বাজার)
থানা ঃ তালা, পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।
০১৭৫১৮২৪৬৫

সোনারী সংসার সম্পর্কে এক পাঠকের মন্তব্য

'সোনালী সংসার' নামক উপন্যাসটির ভাষা, বর্ণনাভঙ্গি, উপস্থাপনা বেশ চমৎকার হয়েছে। একটু খেয়াল করে পড়লেই বুঝা যায় যে, এর মধ্যে কত যে সাহিত্যিকতার ছোঁয়া লেগেছে। এই উপন্যাসটিই যে লেখকের হাতেখড়ি, ইতিপূর্বে যে তিনি কখনো উপন্যাস লিখেননি তা এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দেখে মোটেও বিশ্বাস হয় না। উপন্যাস চরিত্রের ভাব প্রকাশে যথাযথ শব্দ প্রয়োগ দেখে বাকী লেখার মন্তব্য জ্ঞানটুকুও হারিয়ে ফেলেছি। স্বনামধন্য ও বহুল প্রচারিত হৃদয়গলে সিরিজের সফল নায়ক ও ঔপন্যাসিক পাড়ায় নবাগত লেখকের এই সদ্য লিখিত উপন্যাসে আমি কিঞ্চিত, অযাচিত ও অমার্জিত মন্তব্য করার দুঃসাহস নিয়ে মহা বিপাকে পড়েছি। কারণ, ভাষা সম্পর্কে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানটুকুও নাই যার নিরিখে সাধারণ কোন লিখারও মন্তব্য করা যায়। মন্তব্য নামক এই দুরহ কাজে হাত দিয়ে লেখককে কোন বিরক্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলছি কিনা তাই শুধু ভাবছি।

মাওঃ হুসাইন আহমাদ
চালিভাঙ্গা মাদরাসা বাড়ী, মেঘনা, কুমিল্লা।
ফোন ঃ ৯৬৬৯০১৬, মোবাইল ঃ ০১৯১৩৮০৬২৩, ০১৯১৫২৩২২২
বাসা ঃ ০১৯১৫৯০৩৮০, ০১৮৯২৬৪৯১৪ (অনুঃ)

লেখকের জবাব

১. মনিরামপুর, যশোরের ভাই এইচ,এম, যাকারিয়া লিখেছেন, হৃদয় গলে সিরিজের বই আপনার বারবার পড়তে মন চায়। গুনাহ থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে এই সিরিজ আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সবশেষে আপনি সবিনয় অনুরোধ করে বলেছেন, সিরিজটি প্রতি দু'মাসের পরিবর্তে এক মাসে বের করা যায় কিনা? ভাই যাকারিয়া! আপনার চিঠি পড়ে খুব ভালো লেগেছে। বাস্তব সত্য কথা হলো, আমি সবচেয়ে বেশী খুশি হই তখনই, যখন কোনো পাঠক বা পাঠিকা চিঠিতে কিংবা ফোনে বলেন, ভাইজান!

হৃদয় গলে সিরিজ আমার জীবনের মোড় পাল্টে দিয়েছে, এই সিরিজের উসিলায় আমি পাপ থেকে বাঁচতে পারছি, টিভি দেখা ছেড়ে দিয়েছি, পর্দা করতে শুরু করেছি, পিতা-মাতার একান্ত অনুগত হয়ে গেছি, সুন্নত অনুযায়ী চলতে প্রতিজ্ঞা করেছি ইত্যাদি। কারণ এসব কথার দ্বারা আমার মনে এ ধারণা জন্মায় যে, আমি যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে লেখালেখির জগতে পদার্পণ করেছি, সে উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে। আর ভাই! প্রতি এক মাসে সিরিজ বের করার যে প্রস্তাব আপনি পেশ করেছেন তা আপাততঃ সম্ভব না হলেও ভবিষ্যতে তা পারা যায় কিনা সে ব্যাপারে ফিকির করছি। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন।

২. কসবা, বি বাড়ীয়ার ভাই জাবেদ হোসাইন সুজনকে আন্তরিক মোবারকবাদ। আপনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সমাজের তরুণ-তরুণীদের হাতে হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলো তুলে দেওয়ার জন্য পাঠক মহলকে অনুপ্রাণিত করেছেন। সেই সাথে 'যে গল্পে' শব্দদ্বয় সম্বলিত কতিপয় নামও পেশ করেছেন। আমি আপনার আবদার রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

৩. কাউকে কিছু উপহার দেওয়ার সময় কেবল হৃদয় গলে সিরিজের কথা মনে পড়ে অর্থাৎ উহাকেই শ্রেষ্ঠ উপহার বলে মনে হয় এরূপ অনুভূতি ব্যক্ত করে মিরপুর ঢাকা থেকে মুহাম্মদুল্লাহ মাসুম চিঠি পাঠিয়েছেন। ভাই মুহাম্মাদুল্লাহ! দুআ করবেন আপনার ন্যায় সুন্দর অনুভূতি ও মন যেন অন্যদেরও তৈরী হয়। চিঠির জন্য আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ।

৪. হৃদয় গলে সিরিজের প্রতিটি বইয়ের আত্মপ্রকাশে চাঁদপুরের ভাই হাবীবুর রহমান মিসবাহ ঈদের আনন্দের মতোই আনন্দিত হন বলে জানিয়েছেন। সত্যিই ভাই! আপনার আনন্দ দেখে আমাদেরও আনন্দ লাগছে। এবার তাহলে চলুন, এই আনন্দ কি করে অন্যান্য ভাই-বোনদের মাঝেও বন্টন করা যায়, এই ফিকির সকলেই করি। কী বলেন, করবেন না? মতামত বিভাগে চিঠি প্রেরণের জন্য আপনাকে জানাই হাজারো মোবারকবাদ।

৬. রায়পুরা, নরসিংদী থেকে ভাই শফীকুল ইসলাম হৃদয় গলে সিরিজকে নিয়ে একটি কবিতা রচনা করেছেন। আপনার কবিতাটি সত্যিই সুন্দর হয়েছে। আপনি আরো লিখবেন। কেমন? আর হ্যাঁ, একটি কথা সকল

পাঠক-পাঠিকাকে আগাম জানিয়ে রাখি। হৃদয় গলে সিরিজের ১৭তম খন্ডের মতামত বিভাগটি শুধুমাত্র কবিতা দ্বারা সাজানো হবে। সুতরাং সবার নিকট অতিশীঘ্র কবিতা পাঠানোর অনুরোধ রইল।

৭. পুরান বাজার ডিগ্রী কলেজের ছাত্রী মোসাম্মৎ শারমিন আক্তার মদীনা সিরিজের প্রতিটি বইয়ের লেখার মূল্য ৪০ কেটি টাকারও অধিক বলে উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে এও বলেছেন যে, আপনার অনেক বান্ধবী সিরিজের বই পড়ে টেলিভিশন দেখা ও বেপর্দা থেকে বিরত থাকার চির শপথ করেছে। মহান আল্লাহর নিকট দুআ করি, ওগো দয়াময় খোদা! বোন মদীনার বান্ধবীদের ন্যায় অন্যান্য তরুণীদেরও এরূপ শপথ ও দৃঢ় অঙ্গীকার করার তাওফীক দাও। আমীন।

৮. নাসির নগর থেকে মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন, মাইজদী থেকে ভাই মুজীবর রহমান; সরাইল, বি বাড়ীয়া থেকে ভাই আবুল কালাম, সাতক্ষীরা থেকে ভাই তাসলিমুল আলমসহ আরো যারা কষ্ট করে মতামত বিভাগে লেখা পাঠিয়েছেন তাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আর অত্র ১৪তম সিরিজ 'সোনালী সংসার' এর পান্ডুলিপি পাঠ করে কুমিল্লার ভাই মাওলানা হুসাইন আহমদ যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাতে একজন নবীন ঔপন্যাসিক হিসেবে সত্যিই খুশি লাগছে। সোনালী সংসার উপন্যাসখানা অন্যান্য পাঠকদের কেমন লাগলো, তা জানতে পারলে কৃতার্থ হবো এবং ভবিষ্যতে আরো সুন্দর উপন্যাস লিখতে সচেষ্ট হবো ইনশাআল্লাহ। হৃদয় গলে সিরিজের সকল পাঠক পাঠিকার সুস্থ-সুন্দর ও কল্যাণময় জীবন কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

বিনামূল্যে বই!

আপনার হাতে টাকা নেই, আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল নয়। অথচ হৃদয় গলে সিরিজের বই আপনার চাই-ই। কিন্তু কিভাবে বই সংগ্রহ করবেন অধিকাংশ সময় কেবল সেই চিন্তাই নিমগ্ন থাকেন। না ভাই! আপনার আর চিন্তার প্রয়োজন নেই। আজই সময় করে আপনার কোনো হৃদয়বান বন্ধু, পরিচিতজন অথবা আত্মীয়ের কাছে যান। তাকে বুঝিয়ে ১সেট বই সংগ্রহের জন্য তৈরী করে আমাকে যে কোন্ উপায়ে ঠিকানাটি জানিয়ে দিন। সেই সঙ্গে সিরিজের কোনো খন্ডটি সৌজন্য হিসেবে চান তাও জানাতে ভুল করবেন না। ইনশাআল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যে আপনার দেওয়া ঠিকানা অনুযায়ী ডাকযোগে বই চলে যাবে। সেই সাথে যাবে আপনার কাংঙ্খিত উপহারটিও। মনে রাখবেন, গোটা বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে, প্রতিটি ঘরে হৃদয় গলে সিরিজের বই পৌঁছে দেওয়ার যে বৃহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে উল্লেখিত পরিকল্পনাটি এরই একটি অংশ। সেই সাথে এও খেয়াল রাখবেন যে, আপনি যত সেট বইয়ের জন্য যত জন লোক তৈরী করবেন আপনিও ঠিক ততটি বই বিনামূল্যে সৌজন্য হিসেবে পেয়ে যাবেন। অনেকে অবশ্য কোনো দুনিয়াবী বিনিময়ের আশা ছাড়াই হৃদয়গলে সিরিজের ব্যাপক প্রচার-প্রসারের জন্য শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। এ খবরও আমার নিকট অহরহ আসছে। উল্লেখ্য যে, কোনো প্রলোভন নয়, আমার এ পরিকল্পনা কেবল অধিক উৎসাহ প্রদানের জন্যই করা হয়েছে। আল্লাহ পাক সকলের আশা পূর্ণ করুন। -(লেখক)

হৃদয় গলে সিরিজ তাদের জন্য

- ▲ যারা চরিত্রগঠনমূলক হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী গল্প-কাহিনী পড়তে ভালবাসেন।
- ▲ যারা বিভিন্ন প্রকার দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত হয়ে প্রয়োজনীয় মানবীয় গুণাবলী অর্জন করে দুনিয়া ও আখেরাত প্রভূত কল্যাণ অর্জন করতে চান।
- ▲ যারা স্বীয় সন্তান কিংবা অন্য কোন আপনজনকে নেককার, খোদাভীরু, চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্য কোন ভাল বই খোঁজ করছেন।
- ▲ যারা প্রিয়জনকে এমন কোন অমূল্য গ্রন্থ উপহার দিতে চান যা উপহার প্রহীতাকে কেবল খুশিই করবে না, হৃদয়ের খোরাকও যোগাবে।
- ▲ যারা ঈমানের মজবুতী ও নিস্তজ হয়ে পড়া জিহাদী চেতনাকে শাণিত করতে চান।
- ▲ যারা বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদানের জন্য সন্তোষজনক কিছু খোঁজে বেড়াচ্ছেন।
- ▲ যারা নিজেদের পাঠাগারগুলোকে নির্ভরযোগ্য ও শ্রেষ্ঠমানের বই দ্বারা সমৃদ্ধ করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।
- ▲ যারা নিজেদের ভাষণ-বৃক্তৃতাগুলোকে আরও তেজোদ্বীপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার মাধ্যমে মুসলমান নর-নারীদের জীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন।

বইটি নিজে পড়ুন। সংগ্রহে রাখুন। ভাল লাগলে অপরকেও পড়তে এবং সংগ্রহে রাখতে উৎসাহিত করুন।

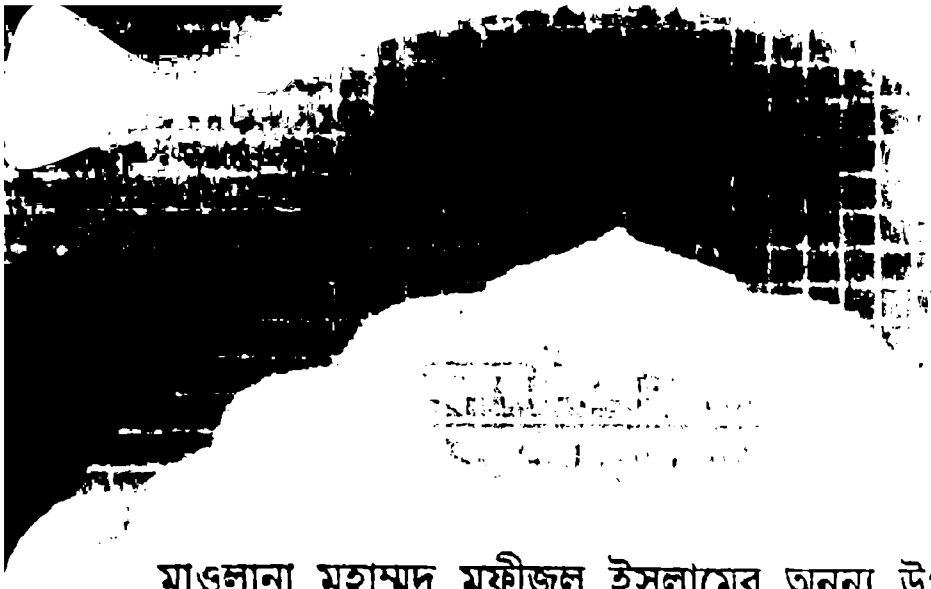

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলামের অনন্য উপহার "হৃদয় গলে সিরিজ"-এর 'হারানো দিনের সোনালী কাহিনী' 'হৃদয়স্পর্শী শিক্ষণীয় কাহিনী', 'সাড়া জাগানো সত্য কাহিনী' পড়ে আমি রীতিমতো বিস্মিত। আমার বিমুগ্ধ চিত্তে জেগে ওঠে বাংলার সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের একটা কথা। প্রথম সার্থক মুসলিম গদ্য লেখক মীর মোশাররফ হোসেনের লেখা পড়ে তিনি সবিস্ময়ে মন্তব্য করেছিলেন-"এই লেখা পড়িয়া মনেই হয় না যে, ইহা কোন মুসলমানের লেখা।" (অর্থাৎ তিনি ধারণা করতে পারেন নি যে, মুসলমানরা এত সুন্দর সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করতে পারে।) মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলামের বইগুলো পড়ে আমিও তাঁর সুরের প্রতিধ্বনি করে বলতে বাধ্য হচ্ছি ঃ 'হৃদয় গলে সিরিজ'-এর লেখা পড়ে মনেই হয় না যে, এগুলো কোন মাদ্রাসার মাওলানার লেখা। আধুনিক ছোট গল্পের ঢংয়ে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা তাঁর কাহিনীগুলো খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছে। যে কোন পাঠকের মনকে তাঁর লেখা আকর্ষণ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি এই প্রতিশ্রুতিবান লেখকের সুদীর্ঘ সফল সাহিত্যিক জীবন কামনা করি।

(মিন্নাত আলী)

সাবেক অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সরকারী মহিলা কলেজ।
শিক্ষাবিদ ও কথাশিল্পী, বাংলা একাডেমীর ফেলো।

www.smfoundationbd.com